কল্পবিজ্ঞান সিরিজ

আনন্দ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

ডুংগা

ডুংগা • সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

আনন্দ
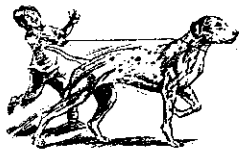
ভুংগা কোনো দিন এ-রকম করে না। সে চুপ করে শুয়ে থাকে দরজার পাশে। এমনভাবে সে দেয়াল ঘেঁষে শুয়ে থাকে যে সহজে তার দিকে নজরই পড়ে না। বাইরের দরজার কাছে নতুন কোনো লোক এলে সে উঠে দাঁড়ায়, লোকটির কাছেও যায় না, ভয়ও দেখায় না, শুধু মুখটা উঁচু করে একবার ডাঁউ করে ডাকে। তখন তার পুরো শরীরটা থাকে দরজা জুড়ে। কেউ ঢুকতে পারবে না। বাড়ির ভেতর থেকে কেউ এসে যখন বলবে, "ভুংগা, সরো!", অমনি ভুংগা লক্ষ্মী ছেলের মতন মাথা নিচু করে সরে যাবে।

বাড়ির সামনে একটা ছোট্ট উঠোন, তারপর লোহার গেট। সেই লোহার গেটে একটি টিনের প্লেটে ইংরেজি-বাংলায় নোটিস লেখা :

Beware of Dogs.
সাবধান, কুকুর আছে
নিজ দায়িত্বে ঢুকিবেন

এরকম লেখা দেখলেই অনেকে ভয় পায়। গেটের এ-পাশে

কেউ চট করে পা বাড়ায় না। যদিও ডুংগা কক্ষনো কারুকে কামড়ায়নি। এ-পাড়াতেই আরও পাঁচটা বাড়িতে কুকুর আছে, কিন্তু সবাই বলে, ডুংগার মতন ভদ্র-কুকুর আর কেউ নয়। আর দেখতেও তাকে কী সুন্দর। ঠিক যেন একটা সাদা রঙের ছোট চিতাবাঘ।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা একটা অন্যরকম ব্যাপার হয়ে গেল।

সেদিন বিকেল থেকেই খুব বৃষ্টি। সন্ধে পর্যন্ত একটানা বৃষ্টি চলল। রাস্তাঘাট ফাঁকা। আস্তে আস্তে জল জমছে। বৃষ্টির জন্য বিকেলবেলা সুজয়ের সঙ্গে ডুংগার লেকে বেড়াতে যাওয়া হয়নি সেদিন। সেজন্য তার মন খারাপ। প্রত্যেকদিন স্কুল থেকে ফিরেই সুজয় ডুংগাকে নিয়ে লেকে যায়। সেখানে একটা রবারের বল নিয়ে সে অনেকক্ষণ ধরে ছুটে-ছুটে খেলে। হঠাৎ কোনো-কোনো লোক একদম পায়ের কাছে ডুংগাকে দেখে ভয় পেয়ে থমকে যায়। কিন্তু সুজয় যেই ডাকে তাকে 'ডুংগা এসো', অমনি সে মাথা নিচু করে বাতাস কেটে সাঁ করে দৌড়ে চলে যায়। সুজয়ের পায়ে মাথা ঘষে দেয় একবার। তখন লোকেরা সুজয়কে বলে, বাঃ, তোমার কুকুরটা তো খুব কথা শোনে!

ডুংগার যখন চার মাস বয়েস তখন সে এ-বাড়িতে এসেছে। সুজয়ের বাবা কুকুর ভালবাসেন না। বাড়িতে কুকুর, বিড়াল, টিয়াপাখি কিছুই পোষা পছন্দ করেন না তিনি। তিনি ভালবাসেন ফুলগাছ। ওদের বাড়ির ছাদে অন্তত একশোটা টবে নানা রকম ফুলগাছ, উঠোনেও রয়েছে অনেকগুলো জুঁই আর বেলফুলের গাছ। তিনি নিজে সেইসব গাছের যত্ন করেন। কিন্তু একদিন সুজয়ের ছোটমাসী বেড়াতে এসে বললেন, "আমাদের বন্ধু কর্নেল কাপুর একটা ডালমাশিয়ানের বাচ্চা দিতে চাইছেন, তোমাদের চেনাশুনো কেউ নেবে? আমার তো বাড়িতে আর-একটা কুকুর

রয়েছে। উনি বিনা পয়সায় দিচ্ছেন, এমনিতে কিন্তু ডালমাশিয়ানের খুব দাম !"

সুজয় তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে বলেছিল, "আমি নেব, ছোটমাসী, আমি নেব... ।"

সুজয়ের মা বললেন, "কুকুর পুষবি কি ? তোর বাবা রাগ করবেন।"

"তুমি একটু বাবাকে বুঝিয়ে বলো, মা। তুমি বললেই হবে।"

"উনি যে কুকুর একদম পছন্দ করেন না।"

"তুমি একটু বলো মা। আমার নিজের কাছে রাখব। বাবার কাছে যাবেই না একদম।"

সুজয়ের বাবা প্রথমে স্রেফ 'না' বলে দিলেন।

তারপর দুদিন সুজয় আর বাড়ির কারুর সঙ্গে কথা বলে না। ভাল করে খায় না। শুধু নিজের ঘরে চুপচাপ শুয়ে থাকে।

সুজয়ের মা আবার গিয়ে বাবাকে বললেন, "আহা, ছেলেটা এত করে চাইছে।"

বাবা তখন বললেন, "ওকে বলো, এবার পরীক্ষায় যদি ফার্স্ট থেকে ফোর্থের মধ্যে হতে পারে, তাহলে ভেবে দেখা যাবে।"

দশদিন বাদেই সুজয়ের পরীক্ষা ! আগের বার সে এইট্থ্ হয়েছিল, এবার এমন জোর-জবরদস্তি করে পড়াশুনা করল যে সেকেন্ড হয়ে গেল। আর বাবার আপত্তি করার কোনো কারণ রইল না।

তারপর থেকে ঐ কুকুরই হল সুজয়ের বন্ধু। সুজয় যখন পড়াশুনো করে, তখন ডুংগা চুপ করে শুয়ে থাকে তার পায়ের কাছে। অন্য সময় খেলা করে এক সঙ্গে। স্কুলে গিয়েও মাঝে মাঝে ডুংগার জন্য মন কেমন করে সুজয়ের।

ডুংগা বাড়ির সবারই কথা শোনে। কোনো জিনিসপত্র নষ্ট করে না। একদিন তাদের বাড়ির ছাদে একটা চোর উঠেছিল, ডুংগার জন্যই সে ধরা পড়ে যায়। চোরটা পাঁচিল ডিঙিয়ে পালাবার চেষ্টা করতেই ডুংগা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে চিত করে ফেলে দেয়। তারপর বুকের ওপর উঠে দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকে। ডুংগা অনেক দূর থেকে ঠিক বাঘের মতন বিদ্যুৎ-গতিতে লাফিয়ে পড়তে পারে। এত শান্ত কুকুর যে হঠাৎ এত জোরে লাফায়, তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। চোরটা 'বাবা রে, মা রে, বাঁচান' বলে এমন কাঁদতে শুরু করে দিল যে, হেসে ফেলেছিল সবাই।

ডুংগা সুজয়ের বাবাকে দেখলেই দৌড়ে এসে পা চেটে দেয়। প্রথম প্রথম উনি খুব বিরক্ত হতেন। চেঁচিয়ে বলতেন, 'জয়, তোমার কুকুরকে সরিয়ে নিয়ে যাও !' তারপর কিন্তু আস্তে-আস্তে উনি নিজেই ওকে আদর করতে শুরু করলেন। কাছে এলে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন। নিজে পার্ক সার্কাস বাজার থেকে মাংস কিনে আনেন ওর জন্য।

সুজয় প্রথম ওর নাম রেখেছিল টাইগার। প্রথম প্রথম ওকে ডেকে বলত, 'টাইগার, কাম হিয়ার ! টাইগার, সীট ডাউন।' তাই শুনে ওর বাবা ওকে বকেছিলেন একদিন। কুকুরের ইংরিজি নাম রাখতে হবে কেন ? কুকুরের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলতেই বা হবে কেন ? কুকুর কি সাহেব ? কুকুরের মাতৃভাষা কি ইংরিজি ? বাঙালী হয়েও কুকুরের সঙ্গে ইংরিজিতে কথা বলা হচ্ছে বোকামি। ওদের যে ভাষা শেখাবে, সেটাই শিখবে।

তখন সুজয় নিজেই ওর নাম বদলে রেখেছে ডুংগা। কারণ এক-এক সময় ও ঠিক ঐ রকম শব্দ করে ডাকে। সুজয় ওকে বাংলাতেই সব কিছু শিখিয়েছে। সুজয় যদি বলে 'শুয়ে পড়ো', ও

অমনি মাটির ওপর ধপাস করে শুয়ে পড়বে। সকালবেলা যদি ওকে বলা যায়, 'ডুংগা, যাও, কাগজটা নিয়ে এসো তো!' ও তক্ষুনি দরজার কাছে ছুটে গিয়ে গোল-করে-বাঁধা খবরের কাগজ মুখে করে নিয়ে আসবে।

কিন্তু সেদিন সন্ধেবেলা সব অন্যরকম হয়ে গেল।

সেদিন বাবার বড়মামা হঠাৎ এসে উপস্থিত। বাবার এই বড়মামা এক সময় আফ্রিকায় থাকতেন। সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন ওয়েস্ট ইন্ডিজে। এখন ভারতবর্ষেই থাকেন, কিন্তু কোনো এক জায়গায় বেশি দিন থাকেন না। বোম্বাই, দিল্লি, কলকাতা, এলাহাবাদ—যেখানে-যেখানে আত্মীয়স্বজন আছে, তাদের এক-একজনের কাছে গিয়ে কিছুদিন করে থাকেন। উনি গেলে সবাই খুব খুশি হয়। কেননা উনি সবাইকে রোজ-রোজ সিনেমা-থিয়েটার দেখান। আর হাজার-হাজার গল্প বলেন। কত যে গল্প উনি জানেন, তার ঠিক নেই।

বাবার সেই হারুমামা সুজয়দের এ-বাড়িতে এসেছিলেন আড়াই বছর আগে। তখন তিনি এ-বাড়িতে কুকুর দেখেননি। আর তিনি আসবার আগে কখনো চিঠি লিখেও জানান না, হঠাৎ-হঠাৎ চলে আসেন।

সেদিন ট্রেন থেকে নেমে হাওড়া স্টেশনে কোনো ট্যাক্সি পাননি। বাসে চেপে চলে এসেছিলেন ঢাকুরিয়া। তারপর বাকি রাস্তাটুকু বৃষ্টির মধ্যে পায়ে হেঁটে এসেছিলেন।

এর ঠিক আগেই তিনি গিয়েছিলেন কোচবিহার। সেখানে তাঁর ছোট ভাই থাকেন। বর্ষার সময় কোচবিহারে খুব বৃষ্টি হয় বলে তিনি সেখানে একটা ছাতা কিনে ফেলেছিলেন। সেই ছাতাটাই হল সর্বনাশের মূল।

উনি গেটের বাইরে কুকুর সম্পর্কে সাবধান-বাণীটা দেখলেন

না। তাড়াতাড়ি গেট ঠেলে ঢুকে পড়লেন। এক হাতে একটা ছোট সুটকেশ, আর এক হাতে খোলা ছাতা। দৌড়ে উঠোনটা পেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন বারান্দায়। বাস থেকে নামার পর উনি খানিকটা কাদার মধ্যে পা দিয়ে ফেলেছিলেন। জুতোর ধপাস-ধপাস শব্দ করে উনি সেই কাদা ঝাড়তে লাগলেন।

বিকেলে বেড়াতে যাওয়া হয়নি বলে মন খারাপ ছিল ডুংগার। একটু আগে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ ঘুম ভেঙে সে দেখল যে, ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবি পরা একটা অচেনা লোক পায়ের কাব্‌লি জুতোয় ধুপধাপ শব্দ করছে।

সে বেশ বিরক্ত হয়ে একবারের বদলে দু'বার ডাকল—ডাঁউ, ডাঁউ!

বাবার হারুমামা এই প্রথম ডুংগাকে দেখলেন। তিনি আফ্রিকায় থাকার সময় অনেক বাঘ-সিংহ দেখেছেন। সুতরাং একটা কুকুর দেখে ভয় পাবেন কেন? তিনি নিজের মনেই বললেন, 'আরে, এই কুকুরটা আবার কোথা থেকে এল!'

তিনি আবার জুতোর ধুপধাপ শব্দ করতে লাগলেন।

ডুংগা এবার দরজা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আরও গম্ভীর গলায় ডেকে উঠল তিনবার।

ততক্ষণে তিন তলার ঘরে বসে সুজয় শুনতে পেয়েছে ডুংগার ডাক। সে একটু অবাক হল! নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল হয়েছে, নইলে ডুংগা এতবার ডাকবে কেন? দোতলা থেকে মা-ও বললেন, "দ্যাখ তো, ডুংগা এত চ্যাঁচাচ্ছে কেন?" সুজয় নীচে নেমে আসতে লাগল, কিন্তু তার আগেই হয়ে গেল যা হবার।

বাবার হারুমামা পর পর দুটো ভুল করলেন। তিনি ডুংগাকে বললেন, "এই সর্‌ সর্‌!" ডুংগা তার উত্তরে বলল, গর্‌র গর্‌র! অর্থাৎ সে বলতে চাইল, কলিং বেল টিপছ না কেন? তোমার
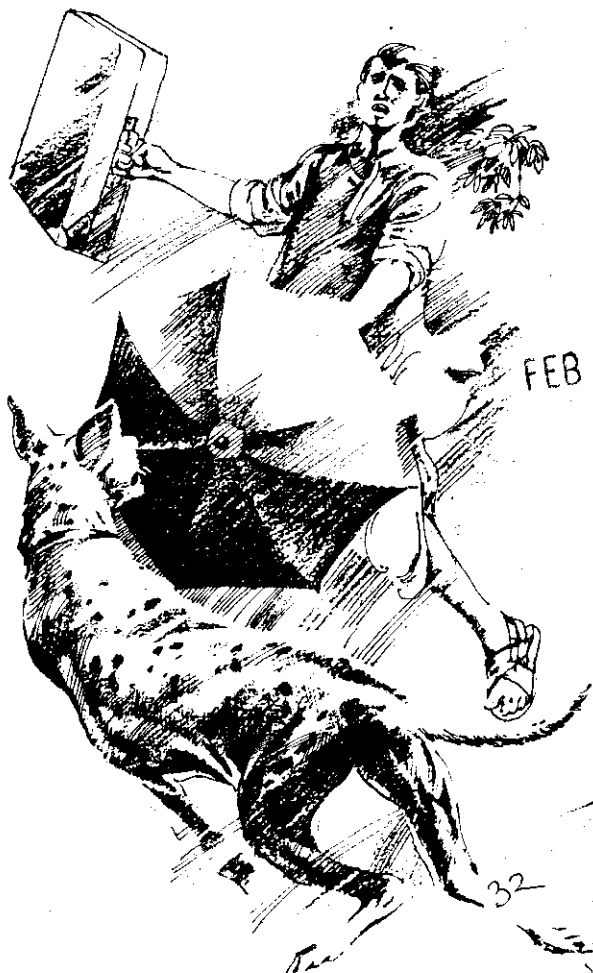
মতলব খারাপ নাকি ? তুমি অচেনা লোক হয়েও আমাকে সরিয়ে ভেতরে ঢুকতে চাইছ ? বাবার হারুমামা তখন খোলা ছাতাটা ডুংগার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে সরে না কেন। কুকুরটা ভারি বেয়াড়া তো !"

বাবার হারুমামা জানেন না যে, ভাল জাতের কুকুরকে কক্ষনো খোলা ছাতা দিয়ে তাড়াবার চেষ্টা করতে নেই। তাতে তারা ভয় পাবার বদলে আরও বেশি রেগে যায়। ডুংগা এবার গলার আওয়াজটা বদলে ফেলে ডাকল, ডাঁউ, ডুংগা ! ডাঁউ, ডুংগা ! অর্থাৎ সাবধান, আমি এখানে আছি।

এরপর দ্বিতীয় ভুলটা হল সত্যিই সাঙ্ঘাতিক। বাবার হারুমামা ছাতাটা দিয়ে ডুংগার নাকে জোরে একটা খোঁচা মেরে বললেন, "এই, হ্যাট্ হ্যাট্ !"

ডালমাশিয়ানের নাকে কেউ খোঁচা মারে ? এই কুকুর আর সব সহ্য করবে, কিন্তু নাকে আঘাত কিছুতেই সহ্য করে না। শুধু রাগ নয়, এতে তাদের অপমান হয়। এবার ডুংগা প্রাণকাঁপানো একটা ডাক দিলে। তারপর চোখের নিমেষে লাফিয়ে ছাতাটা পার হয়ে এসে বাবার হারুমামার হাত কামড়ে ধরল।

ওঁর সব সাহস উপে গেল সেই মুহূর্তে। উনি চিৎকার করে উঠলেন, "ওরে বাবা রে, পাগলা কুকুর। মেরে ফেললে রে !"

চ্যাচামেচি শুনে সুজয়, তার মা আর দিদি সবাই দৌড়ে নেমে এসেছে। হারুমামা তখন ভয় পেয়ে মাটিতে বসে পড়েছেন আর ডুংগা তাঁর হাত কামড়ে ধরে আছে।

সুজয় দূর থেকে দেখেই বলল, "ডুংগা, ছাড় ছাড় !"

এই প্রথম ডুংগা সুজয়ের কথা শুনল না।

হারুমামা তখনো চ্যাচাচ্ছেন, "মেরে ফেললে, পাগলা কুকুর, ধরো, শিগগির ধরো।"

সুজয় এসে ডুংগার কান ধরে টেনে সরিয়ে আনবার চেষ্টা করল। ডুংগা তবুও আসবে না। সুজয় তার ঘাড়ের ওপর খুব জোরে দুটো চড় মেরে দিয়ে বলল, "ডুংগা, কথা শোনো, সরে যাও!"

ডুংগা তার কামড় খুলে এবার একটুখানি পিছিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু তার রাগ কমেনি। সে হিংস্রভাবে দাঁত বার করে গর্‌র্‌ গর্‌র্‌ করতে লাগল! হারুমামা বললেন, "ওটাকে সরিয়ে নিয়ে যা, পাগলা কুকুর, আবার কামড়াবে—"

এই কথা শুনে ডুংগা যেন সত্যিই আবার ঝাঁপিয়ে কামড়াতে এল।

এবার সুজয়েরও রাগ হয়ে গেল খুব। কুকুরটা হঠাৎ এরকম অবাধ্য হয়ে গেল? বাবার হারুমামা এত ভাল লোক, তাকে কামড়ে দিয়েছে! ডুংগা আবার লাফাতে যেতেই সুজয় তাকে আটকাবার জন্য পা বাড়াল। তবু ডুংগা এগিয়ে আসতেই সুজয়ের পা তার পেটে লাগল খুব জোরে।

মা বললেন, "জয়, দেখিস, সাবধান! ও খেপে গেছে মনে হচ্ছে।"

ডুংগা কিন্তু আর কিচ্ছু করল না। সুজয়ের মুখের দিকে একবার তাকাল মুখ তুলে, তারপর পেছন ফিরে দৌড়ে পালাল।

হারুমামা মাটির ওপর শুয়ে পড়েছেন। ওল্টানো ছাতাটা গড়াচ্ছে পাশে। উনি বললেন, "পাগলা কুকুর কামড়েছে, জলাতঙ্ক হবে, জলাতঙ্ক।"

ঠিক সেই সময় সুজয়ের বাবা এসে পৌঁছলেন। তিনি প্রথমেই দারুণ চমকে গিয়ে বললেন, "ওমা, এ কী? হারুমামা, কী হয়েছে? মাটিতে শুয়ে আছেন কেন?"

হারুমামা বললেন, "জলাতঙ্ক...চোদ্দটা ইঞ্জেকশান...ওরে বাবা

রে..."

সব শুনে বাবা আরও অবাক হয়ে বললেন, "ডুংগা কামড়েছে ? সে তো কখনো কামড়ায় না ! কত নতুন লোক আসে..."

তিনি হারুমামার হাতটা তুলে নিয়ে দেখলেন, সত্যিই ডুংগা দু-তিন জায়গায় কামড়ে রক্ত বার করে দিয়েছে। অবশ্য খুব বেশি দাঁত বসায়নি। বাঘের মতন কুকুর, ইচ্ছে করলে পুরো হাতখানাই খেয়ে নিতে পারত।

বাবা বললেন, "হারুমামা, উঠে পড়ুন। আমি ওষুধ লাগিয়ে দিচ্ছি !"

হারুমামা বললেন, "না, না, এমনি ওষুধে হবে না। ডাক্তার ডাক...জলাতঙ্ক...আমার সামনে এখন জল এনো না..."

যদিও বাড়ির সবাই বুঝল যে, এইটুকু কামড়ানোর জন্য ডাক্তার ডাকার দরকার নেই, কিন্তু হারুমামা বারবার ডাক্তারের কথা বলতে লাগলেন। ডুংগা বাইরের কোনো কুকুরের সঙ্গে মেশে না, তাছাড়া তাকেই ইঞ্জেকশান দেওয়ানো আছে।

বাবা তাঁর হারুমামাকে ধরাধরি করে এনে বৈঠকখানায় সোফার ওপর শুইয়ে দিলেন। তারপর সুজয়কে বললেন, "যা তো, অজয়কে একবার ডেকে নিয়ে আয়।"

ডাক্তার অজয় লাহিড়ীর চেম্বার রাস্তার মোড়েই। সুজয়দের সঙ্গে খুব চেনা। সুজয় তাঁকে কাকাবাবু বলে ডাকে। তিনি একজন রোগী দেখছিলেন, আরও অনেক রোগী অপেক্ষা করে আছে। সুজয় তাঁর চেয়ারের পাশে গিয়ে বলল, "এক্ষুনি একবার আমাদের বাড়িতে চলুন।"

অজয় ডাক্তার মুখ তুলে বললেন, "কেন ? কী হয়েছে ?"

নিজের পোষা কুকুর ডুংগা যে কারুকে কামড়েছে, সে-কথা

বলতে লজ্জা হল সুজয়ের। এত পোষা কুকুর, এত প্রিয় কুকুর! কিন্তু সত্যিই তো কামড়েছে। সুজয় নিজের চোখে দেখেছে। সে ডাকলেও কথা শোনেনি। ডুংগা কি সত্যি পাগল হয়ে গেল?

সুজয় বলল, "চলুন না, তাড়াতাড়ি—"

"কী হয়েছে বলবি তো?"

"আমাদের বাড়িতে একজনকে কুকুরে কামড়েছে!"

"কাকে কামড়াল? কোন্ কুকুর? তোর কুকুর ডুংগা না বাইরের কুকুর?"

অন্য রোগীদের একটু অপেক্ষা করতে বলে অজয় ডাক্তার হাতে ব্যাগ নিয়ে বেরিয়ে এলেন। রাস্তায় এসে আবার জিগ্যেস করলেন, "কে কামড়েছে? ডুংগা? সে তো কক্ষনো কারুকে কামড়ায় না!"

নিজের মুখে ডুংগার দোষের কথা বলতে গিয়ে অপমানে সুজয়ের বুক ফেটে গেল। তবু তাকে বলতেই হল, "হ্যাঁ।"

"আশ্চর্য তো! ডুংগা তো কখনো কারুকে তাড়াও করে যায় না, অতি ভদ্র কুকুর!"

"আচ্ছা কাকাবাবু, ডুংগা হঠাৎ পাগল হয়ে যেতে পারে?" কথাটা বলার সময় সুজয়ের গলায় কান্না এসে গেল। অজয় ডাক্তার তার কাঁধ চাপড়ে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "না, না, বাড়ির কুকুর এমনি এমনি পাগল হতে যাবে কেন?"

বাড়িতে এসে অজয় ডাক্তার হারুমামাকে ভাল করে পরীক্ষা করলেন। তারপর বললেন, "বিশেষ কিছু হয়নি। হঠাৎ বিরক্ত হয়ে কামড়ে দিয়েছে। বেশি রাগলে মাংস ছিঁড়ে নিত।"

হারুমামা বললেন, "বিরক্ত মানে? কুকুর কি মানুষ যে যখন-তখন বিরক্ত হবে? কুকুরটা পাগল হয়ে গেছে নিশ্চয়ই!"

ডাক্তারবাবু বললেন, "পাগল হলে কি আর এত সহজে ছেড়ে

দিত ? পাগলা কুকুরকে থামানো যায় না !"

হারুমামা বললেন, "কিন্তু আমি দেখেছি, কুকুরটার ল্যাজ ঝুলে গিয়েছিল। পাগলা কুকুরের ল্যাজ ঝোলা থাকে। ওরে বাবা রে, শেষে কি জলাতঙ্ক রোগে মরব ? আমায় এখনো ইঞ্জেকশান দিচ্ছ না কেন ? বেশি দেরি হয়ে গেলে..."

এক-একজন লোক ওষুধ খেতে কিংবা ইঞ্জেকশান নিতে খুব ভালবাসে। বোঝা গেল হারুমামাও সেইরকম একজন লোক। ইঞ্জেকশান না নিয়ে তিনি ছাড়বেন না।

অজয় ডাক্তার তখন তাঁকে কী যেন একটা ইঞ্জেকশান দিয়ে দিলেন। আর দিলেন তিন দিনের খাবার ওষুধ। তারপর বললেন, "তিন দিন পরে আবার আপনাকে পরীক্ষা করে দেখব। যদি জলাতঙ্ক রোগের চিহ্ন দেখা যায়, তা হলে চোদ্দটা ইঞ্জেকশান দিতে হবে !"

চলে যাবার সময় অজয় ডাক্তার ফিসফিস করে বাবার কানে কানে বলে গেলেন, "কিছুই হয়নি, শুধু ওঁকে ভোলাবার জন্য একটা ভিটামিন ইঞ্জেকশান দিয়ে গেলাম, তাতে ক্ষতিও কিছু হবে না।"

ইঞ্জেকশান নেবার পর হারুমামা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠলেন। উঠে বসে বললেন, "কী একটা বিচ্ছিরি বাজে কুকুর পুষেছিস তোরা ? ছ্যা ছ্যা ! ভদ্দরলোক দেখলে চিনতে পারে না ? আমি কি শিশি-বোতলওয়ালা না পিওন যে আমাকে দেখে তাড়া করে আসবে ? কুকুর দেখেছিলাম বটে আফ্রিকার কঙ্গোতে। এক সাহেবের সতেরোটা কুকুর ছিল। ককার স্প্যানিয়েল, ডাক্‌শুন, স্পিৎজ, গ্রে হাউন্ড...সব কুকুর এক সঙ্গে মিলেমিশে থাকে। কী ট্রেনিং, সাহেব একবার শিস দিলেই ঝাঁক বেঁধে দৌড়ে আসে, এত সুন্দর দেখায় তখন..."

রাত্রে খেতে বসেও অনেক রকম কুকুরের গল্প হতে লাগল। কোন্ বাড়ির নতুন জামাইকে নাকি সে-বাড়ির পোষা কুকুর কামড়ে একেবারে মেরেই ফেলেছিল। কোথায় একটা অ্যালসেশিয়ান হঠাৎ পাগলা হয়ে গিয়ে পর পর এগারোজন লোককে কামড়ে দিয়েছিল...

সুজয় মুখ শুকনো করে বসে আছে। সে এসব কিছুই শুনছে না। তার মনের মধ্যে শুধু একটাই কথা ঘুরছে। ডুংগা কোথায় গেল ? সেই ঘটনার পর থেকে আর ডুংগাকে দেখা যায়নি। সুজয় এর মধ্যে দুবার সারা বাড়ি খুঁজে দেখে এসেছে। ডুংগার কথাটা এখানে সে বলতেই সাহস পাচ্ছে না। সে-কথা তুললেই সবাই নিশ্চয়ই তাকে বকুনি দেবে।

হারুমামা সুজয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "কুকুর পুষতে জানে সাহেবরা। বাঙালীরা কুকুরকে ঠিক মতন ট্রেনিং দিতেই জানে না।"

সুজয় মাথা নিচু করে হাত ধুতে উঠে চলে গেল।

রাতে শুতে যাবার আগে মা জিগ্যেস করলেন, "কুকুরটা গেল কোথায় ? তাকে তো আর দেখছি না ?"

বাবা বললেন, "বুঝতে পেরেছে তো যে দোষ করেছে। তাই কোথাও লুকিয়ে আছে নিশ্চয়ই।"

সুজয় বলল, "না, ও কোথাও নেই। আমি খুঁজে দেখেছি।"

মা বললেন, "কোথায় আর যাবে ? ও বাড়ির বাইরে কক্ষনো যায় না ! এ-বেলা তো খায়ওনি কিছু। গেটের কাছে ওর খাবার রেখে দে জয়। ও ঠিকই আসবে।"

প্রত্যেক রাত্রে ডুংগা গেটের সামনে বসে পাহারা দেয়। একদিনও তার নড়চড় হয়নি এ পর্যন্ত। ডুংগা একা-একা রাস্তাতে যায় না কখনো। তাই গেটের কাছে তার জন্য মাংস রেখে দিয়ে

সবাই শুতে চলে গেল।

শুয়ে-শুয়ে সারা রাত ছটফট করল সুজয়। তার ভাল করে ঘুম হল না। মাঝে মাঝেই বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি স্বপ্ন দেখে সে জেগে উঠছিল অনেকবার।
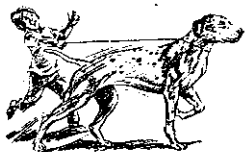
ভোর হতেই সুজয় বিছানা ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে নেমে দৌড়ে চলে এল সদর দরজার কাছে। ডুংগা সেখানে নেই।

লোহার গেট খুলে সে এদিক-ওদিক তাকাল। কোনো চিহ্নই নেই ডুংগার। তার খাবার মাংস সেইরকমই পড়ে আছে।

তক্ষুনি আবার দোতলায় উঠে এসে মায়ের ঘরে ধাক্কা দিল। দরজা খুলতেই মাকে সুজয় খুব ব্যস্তভাবে বলল, "মা, ডুংগা নেই। সারারাত ফেরেনি। আমি ওকে খুঁজতে যাচ্ছি।"

বাবা বললেন, "কোথায় খুঁজতে যাবি, এত সকালে ?"

সুজয় বলল, "কাছাকাছি রাস্তাগুলো ঘুরে দেখে আসি, নিশ্চয়ই কোথাও রাগ করে শুয়ে আছে।"

বাবা বললেন, "অত আর লাই দিতে হবে না। যাকে-তাকে কামড়াতে শুরু করেছে, এমন কুকুরকে আবার আদর দিতে হবে কেন ? খিদে পেলে নিজেই আসবে।"

মা বললেন, "ও মা, সে কী ! কুকুরটা এতদিন ধরে বাড়িতে রইল, হঠাৎ এমনভাবে চলে যাবে ? কাল সারা রাত খেতে আসেনি যখন, নিশ্চয়ই কিছু একটা হয়েছে। একবার খুঁজে দেখা হবে না ?"

সুজয় বলল, "আমি একটু লেক পর্যন্ত দেখে আসব ?"

বাবা বললেন, "একা যাসনি । সুখেনকে সঙ্গে নিয়ে যা !"

সুখেনদা বাবার অফিসে কাজ করে, থাকে সুজয়দের বাড়িতে । সুজয় তাকে ঘুম থেকে টেনে উঠিয়ে নিয়ে গেল ।

ওরা ফিরল প্রায় আড়াই ঘণ্টা বাদে। কাছাকাছি সবকটা রাস্তায় ঘুরেছে। বালিগঞ্জ লেকের এ-পাশ থেকে ও-পাশ পর্যন্ত খুঁজে দেখল। কোথাও ডুংগা নেই। সুজয়ের চোখে এক্ষুনি-জল-পড়বে-পড়বে ভাব ।

বাবা তখন অফিসে যাবার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন । সব শুনে বললেন, "থানায় একবার খবর দিতে হবে ।" নিজেই তিনি ফোন করলেন থানায় ।

থানার লোকজন এমনিতেই কত কাজ নিয়ে ব্যস্ত। সামান্য কুকুর হারাবার মতন ব্যাপার নিয়ে তাঁদের মাথা ঘামাবার সময় নেই। তবু একজন মজা করে বললেন, "শহরে ছেলে-ধরার মতন কুকুর-ধরাও বেরিয়েছে, শোনেননি ? এরপর বেড়াল-ধরাও বেরুবে। বাড়িতে বেড়াল আছে নাকি ? সাবধানে রাখবেন।"

বাবা গম্ভীরভাবে জিগ্যেস করলেন, "আপনাদের পক্ষে কোনো সাহায্য করা সম্ভব নয় তা হলে ?"

থানার লোকটি বললেন, "কুকুরের গলায় মালিকদের নাম-ঠিকানা লেখা চাক্তি বাঁধা আছে তো ? কেউ ধরে থানায় জমা দিলে ফেরত পাবেন। আর কুকুর যদি রাস্তায় কারুকে কামড়ায়, সে জন্য দায়ী হবেন আপনারাই।"

বাবা ফোন রেখে দিলেন । কুকুরের গলায় আবার নাম-ঠিকানা লেখা চাক্তি বেঁধে রাখে নাকি কেউ ? সে তো বিচ্ছিরি দেখায় ! তাছাড়া ডুংগা এত বাধ্য যে, তার গলায় চেনই বাঁধতে হয় না কখনো ।

বাবা সুজয়কে বললেন, "ও যদি রাস্তাঘাটে কারুকে কামড়ায় তাহলে কিন্তু ওর মালিক হিসেবে তোমাকে জেলে ধরে নিয়ে যাবে।"

সুজয় বলল, "ও কারুকে কামড়াবে না।"

বাবা বললেন, "হুঁ! তা হলে কাল হারুমামাকে কামড়াল কেন?"

সুজয় বলল, 'উনি কেন ছাতা দিয়ে ডুংগার নাকে মেরেছিলেন? পোষা কুকুরকে কেউ মারে?"

বাবা বললেন, "ছিঃ, গুরুজনদের সম্পর্কে ওভাবে কথা বলতে নেই।"

এরপর "পশুক্লেশ নিবারণী সমিতি" আর "কুকুর-প্রেমিক-সমিতি"-তেও ফোন করা হল। ওঁরাও কোনো সাহায্য করতে পারলেন না। সবাই বললেন, পোষা কুকুর কক্ষনো বাড়ি ছেড়ে চলে যায় না। ফিরে আসে ঠিক।

বাবা সুজয়কে বললেন, "সারা দিনের মধ্যে নিশ্চয়ই ফিরে আসবে কোনো সময়ে। আদরের কুকুর, মাংস ছাড়া কিছু খায় না, রাস্তায় মাংস কোথায় পাবে?"

অফিস যাবার সময় বাবা রোজ সুজয়কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যান। সেদিন সুজয়ের স্কুলে যাবার মোটেই ইচ্ছে ছিল না, তবু যেতে হল। কিন্তু স্কুলে একদম মন বসল না। সব সময় মনে পড়ছে ডুংগার কথা। সারা রাত ডুংগা কোথায় রইল? গত দেড় বছরের মধ্যে সে একদিনও বাড়ির বাইরে থাকেনি।

স্কুল ছুটি হতেই এক দৌড়ে বাড়ি ফিরে এল। খুব আশা করেছিল, ফিরে এসেই দেখবে যে, ডুংগা শুয়ে আছে গেটের কাছে। তাকে দেখেই ছুটে এসে পায়ে মাথা ঘষবে!

কিন্তু ডুংগা নেই।

দোতলায় মা-ও মন খারাপ করে বসে আছেন। কুকুরটা সারাদিনেও এল না। তবে কি আর কক্ষনো আসবে না ?

সুজয়ের ছোড়দি বলল, "আমার কি ভয় হচ্ছে জানো মা ? ডুংগা গাড়ি চাপা পড়েনি তো ?"

সুজয় সঙ্গে সঙ্গে ভয় পেয়ে বলল, "না !"

দিদি বলল, "পোষা কুকুর রাস্তায় একলা চলতে শেখে না তো ! চলন্ত গাড়ির সামনে দিয়ে হঠাৎ হয়তো দৌড়ে যাবে। গোল পার্কের কাছটায় গাড়িগুলো এমনভাবে যায় যে, আমরাই দিশেহারা হয়ে যাই। কিংবা ডুংগা হয়তো আত্মহত্যাও করতে পারে। জয় লাথি মেরেছে বলে ডুংগার অপমান হয়েছে।"

সুজয়ের সারা শরীরটা কেঁপে উঠল। ডুংগাকে সে আগে কোনোদিন মারেনি। কিন্তু কাল না-মেরেই বা উপায় ছিল কী ? ডুংগা কথা শুনছিল না কারুর। বাবার হারুমামাকে তেড়ে-তেড়ে যাচ্ছিল।

দিদি আবার বলল, "তুই লাথি মারার পর ডুংগা তোর মুখের দিকে কীরকম ভাবে তাকিয়েছিল, তুই লক্ষ করিসনি, জয় ? ডুংগা এমন অবাক হয়ে গিয়েছিল !"

সুজয় আর এসব কথা একদম শুনতে চায় না।

কোনোরকমে একটুখানি জলখাবার খেয়েই সে কারুকে কিছু না বলে বেরিয়ে গেল বাড়ি থেকে। সোজা ছুটে গেল বালিগঞ্জ লেকে।

এখন বিকেল পাঁচটা। ঠিক এই সময়, বৃষ্টির দিন ছাড়া, প্রত্যেক দিন সুজয় ডুংগাকে নিয়ে লেকে এসেছে। সুজয় একটা শিস দিলে ডুংগা অমনি লাফাতে লাফাতে তার সঙ্গে ছুটত লেকের দিকে। রোজ ঠিক সময় বেড়াতে বেরুলে সেটা কুকুরদের একটা নেশার মতন হয়ে যায়।

সুজয়ের দৃঢ় বিশ্বাস, ডুংগা যেখানেই থাকুক, বিকেলবেলা লেকে ঠিক একবার আসবেই।

লেকে আরও অনেক লোক এই সময় কুকুর নিয়ে বেড়াতে আসে। নানান জাতের কুকুর। কিন্তু একটাও ডালমাশিয়ান দেখতে পাচ্ছে না সুজয়। এক-একদিন সকালবেলা সুজয় এখানে এসে দেখেছে যে, একজন ভদ্রলোক তাঁর মেয়েকে নিয়ে এখানে বেড়াতে আসেন, তাঁদের সঙ্গে থাকে একটা ডালমাশিয়ান। সেটা ছাড়া এ পাড়ায় আর কারুর ঐ জাতের কুকুর সুজয় দেখেনি।

বড় লেকের ধারে একটা সোনাঝুরি গাছের নীচে বেঞ্চে বসে রইল সুজয়। ডুংগার সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ ছোটাছুটির পর প্রত্যেকদিন সে এখানেই বসে। আজ কি ডুংগার মনে পড়বে না সে-কথা ? একবার সে সুজয়ের পায়ে মাথা ঘষতে আসবে না ?

সুজয় একঘন্টা বসে রইল। কিন্তু কোথায় ডুংগা ? তারপর যখন অন্ধকার হয়ে এল, তখন সুজয় দু'হাতে মুখ ঢাকা দিয়ে কিছুক্ষণ কাঁদল। ডুংগার জন্য তার যে কী অসম্ভব কষ্ট হচ্ছে তা সে বলে বোঝাতে পারবে না। তার ফোঁপানির শব্দ শুনে দু-একজন চিনেবাদামওয়ালা, দু-একজন অন্য লোক একটু থমকে দাঁড়াল, কিন্তু কেউ কিছু বলল না। কেউ যখন খোলা জায়গায় বসে একা-একা কাঁদে, তখন কোনো মানুষ তাকে সান্ত্বনা দেয় না।

একটু পরেই চোখের জল মুছে সুজয় উঠে পড়ল। আর বেশি দেরি করলে বাড়ির সবাই চিন্তা করবেন। সাতটার সময় মাস্টারমশাই আসবেন আজ। সুজয় বুঝতে পারল, ডুংগাকে সে আর ফিরে পাবে না।

লেক থেকে বেরিয়ে, গড়িয়াহাট ব্রিজ পেরিয়ে যোধপুরের

প্রথম মোড়ে এসে সুজয় হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। একটা চেনা কুকুরের ডাক। ঠিক ডুংগার মতন। ডান দিকের রাস্তা থেকে আসছে ডাকটা। কিছু না ভেবেই সুজয় সেদিকে ছুটল।

সে অস্পষ্টভাবে দেখতে পেল অনেক দূরে একটা লোক একটা কুকুরের গলায় চেন বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। কুকুরের রংটা সাদা-সাদা মতন।

কিন্তু সুজয় সেখানে পৌঁছবার আগেই লোকটি বেঁকে গেল অন্য একটা রাস্তায়। যোধপুরের রাস্তাগুলো গোলকধাঁধার মতন, এতদিন এ-পাড়ায় থেকেও সুজয় ঠিকমতন চিনতে পারে না। খানিকক্ষণ এ-রাস্তা ও-রাস্তায় ঘোরাঘুরি করেও সুজয় আর দেখতে পেল না লোকটিকে। অদৃশ্য হয়ে গেল নাকি ?

তারপর সুজয় এক জায়গায় থেমে গিয়ে ভাবল, সে মিথ্যেই ছোটাছুটি করছে। ঐ কুকুরটা নিশ্চয়ই ডুংগা নয়। ডুংগাকে চেন দিয়ে বাঁধবে, এত সাহস কার ? না, ডুংগা সত্যিই হারিয়ে গেছে, সে আর ডুংগাকে পাবে না।

ঠিক তক্ষুনি সে কাছেই একটা বাড়ির তিনতলায় ডাক শুনল, ভাঁউ, ভাঁউ ! এ তো ঠিক ডুংগা। এ ডাক চিনতে তো তার ভুল হবে না। সুজয় সেই বাড়িটা লক্ষ করে ছুটল।

বাড়িটার সদর দরজা খোলাই ছিল। সুজয় সোজা উঠে গেল তিনতলায়। দুদিকে দুটো ফ্ল্যাটের দরজা। যে-দিক থেকে আওয়াজ এসেছিল, সেদিকের দরজার কলিং বেল টিপল।

দরজা খুলল একটি সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে। সুজয় কিছু জিগ্যেস করবার আগেই মেয়েটি বলল, "বাবলু এখন যাবে না। এখন পড়াশুনো করবে। খালি দিনরাত আড্ডা আর আড্ডা !"

বাবলু কে, সুজয় তাই জানে না। মেয়েটি না-জেনেই তাকে

বকুনি দিয়ে উঠল ? সুজয়ের বকুনি খাওয়ার অভ্যেস নেই।

সে গম্ভীরভাবে বলল, "আমাদের কুকুর আপনাদের বাড়িতে এসেছে ?"

মেয়েটি বলল, "কুকুর ? তোমাদের কুকুর এখানে আসবে কেন ? না। কোনো কুকুর তো এখানে আসেনি।"

খোলা দরজা দিয়ে একটা ঘর ও একটা বারান্দা দেখা যায়। সেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে ডুংগা।

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলল, "ঐ তো !"

মেয়েটি বলল, "ওটা তোমাদের কুকুর ? বা রে। ও কথা বলো না, রবি শুনলে তোমাকে গাঁট্টা মারবে !"

সুজয় মেয়েটিকে পাশ কাটিয়ে ঘরের মধ্য দিয়ে দৌড়ে বারান্দার দিকে গিয়ে ডাকল, "ডুংগা !"

উত্তেজনায় সুজয়ের বুকের মধ্যে দুম-দুম শব্দ হচ্ছে। তা হলে

সত্যিই ডুংগাকে খুঁজে পাওয়া গেল ! এখন ডুংগাকে আটকে রাখার সাধ্য আর কারুর নেই ।

সুজয় দু'বার শিস দিল ।

মেয়েটি ভয়-পাওয়া গলায় চেঁচিয়ে উঠল, "এই, এই, কাছে যেও না !"

ডুঙ্গা গম্ভীর গলায় ডাকল, ভাউ ! তারপর লেজ নাড়তে লাগল ।

বারান্দার রেলিংয়ের সঙ্গে একটা চেন দিয়ে ডুংগাকে বাঁধা ।

চেনটা খুলে দিতে হবে, সেইজন্যই ডুংগা ছুটে আসতে পারছে না। সুজয় শিস দিতে-দিতে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ কুকুরটা ভয়ংকরভাবে ডেকে উঠে সুজয়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, আর ঠিক সেই মুহূর্তে কে একজন সুজয়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে এল পেছনে।

সুজয় দেখল, তার থেকে ছ-সাত বছরের বড় একজন ছেলে। সেই ছেলেটি সুজয়কে বলল, "তুমি করছ কী ভাই, তুমি পাগল ? এক্ষুনি যে ও তোমাকে কামড়ে ছিঁড়ে ফেলবে !"

সুজয় হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, "আমার কুকুর আমাকে কামড়াবে না। আয় ডুংগা, আয়, আয়—"

কুকুরটা হিংস্রভাবে হাঁ করে কামড়াতে এল সুজয়কে।

এবার সে নিজেই পিছিয়ে এল। অভিমানে তার চোখে জল এসে যাবার উপক্রম। ডুংগা তাকে চিনতে পারছে না ? কিংবা ডুংগা তার ওপর এত রেগে গেছে যে, তাকে কামড়াতে আসছে। ডুংগা পরের বাড়িতে থাকতে চায় ? সুজয়ের বাড়ি কি ডুংগারও বাড়ি নয় ?

দরজার কাছ থেকে মেয়েটি বলল, "রবি, এই ছেলেটা জোর করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। বলছে, এটা ওর কুকুর !"

রবি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে সুজয়কে জিগ্যেস করল, "এটা তোমার কুকুর ? এটা কী কুকুর, তার নাম জানো ? কুকুর চেনো তুমি ? বলো তো এটা অ্যালসেশিয়ান না স্প্যানিয়েল ?"

সুজয় বলল, "এটা ডালমাশিয়ান ! এর নাম ডুংগা ! আপনারা জোর করে ওকে বেঁধে রেখেছেন।"

ছেলেটি আর মেয়েটি দু'জনেই হেসে উঠল এবার। ছেলেটি বলল, "জোর করে বেঁধে রেখেছি ? আমি এসে না ধরলে ও তোমার মাংস খুবলে নিত।"

তারপর রবি বারান্দায় গিয়ে বলল, "রেক্স, স্ট্যান্ড আপ ! সে 'হ্যালো' টু দিস বয় !"

কুকুরটা অমনি পেছনের দু' পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঠে দু'বার ডাকল—ডাঁউ ডাঁউ ! তারপর রবির পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঘষতে লাগল ।

সুজয়ের তবু বিশ্বাস হচ্ছে না । সে বলল, "আমি এ-পাড়া দিয়ে অনেকদিন ঘুরেছি । কোনো বাড়িতে তো ডালমাশিয়ান দেখিনি !"

মেয়েটি বলল, "আমরা আগে এলাহাবাদ ছিলাম । একমাস হল কলকাতায় এসেছি ।"

সুজয় খুব ভাল করে কুকুরটাকে দেখল । অবিকল ডুংগারই মতন । তবে ডুংগার চোখ দুটো আরও বেশি চকচকে । এই কুকুরটার বোধহয় বয়েস একটু বেশি ।

রবি বলল, "তোমার বুঝি কুকুর হারিয়েছে ?"

সুজয় বলল, "হ্যাঁ ।"

মেয়েটি বলল, "রবি, কাল আমরা আর একটা ডালমাশিয়ান দেখেছিলাম না এই রাস্তায় ?"

সুজয় বলল, "ক'টার সময় বলুন তো ?"

মেয়েটি বলল, "এই সাতটা, সাড়ে সাতটা—"

সুজয় বলল, "হ্যাঁ, ঠিক । ঐ সময়েই—"

রবি জিগ্যেস করল, "কী করে হারাল ?"

সুজয় বলল, "বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছে ।"

রবি বলল, "পালিয়ে এসেছে ? পোষা কুকুর ? খাঁটি জাতের ডালমাশিয়ান তো কখনো বাড়ি থেকে পালায় না । কতদিন ধরে পুষছ ?"

"দেড় বছর ! আচ্ছা, আমি যাই !"

"আরে, একটু বসো। তোমার সঙ্গে কথা বলি দু-চারটে।"

"না, আমাকে এক্ষুনি বাড়ি ফিরতে হবে, নইলে মুশকিল হবে।"

"বাড়ি ফিরে যাবে ? কুকুরটা খুঁজবে না ?"

"কাল সন্ধেবেলা থেকে পালিয়েছে। এখন আর খুঁজে কী হবে ?"

রবি এবার সুজয়ের কাঁধে হাত দিয়ে বলল, "একটু বসো। তুমি দেড় বছর কুকুর পুষছ, আর আমার কাছে এই কুকুরটাই আছে সাত বছর। এর আগেও আমাদের বাড়িতে অন্য কুকুর ছিল। সুতরাং তোমাকে আমি কুকুর বিষয়ে কিছু উপদেশ দিতে পারি।"

রবি জোর করে সুজয়কে বসিয়ে দিল একটা চেয়ারে। মেয়েটি এর মধ্যে একটা প্লেটে করে দুটি সন্দেশ আর এক গেলাস জল নিয়ে এসে বলল, "এটা খাও।"

সুজয় মিনমিনে গলায় বলল, "আমি কিছু খাব না। আমার খেতে ইচ্ছে করছে না।"

মেয়েটি বলল, "অন্তত জলটা খেয়ে নাও! তোমার মুখখানা বড্ড শুকিয়ে গেছে। তুমি বুঝি খুব ভালবাসতে কুকুরটাকে ?"

রবি জিগ্যেস করল, "কী হয়েছিল বলো তো ? কুকুরটা পালাল কেন ?"

সুজয় খুব সংক্ষেপে গতকাল সন্ধেবেলার ঘটনাটা জানাল।

রবি শিউরে উঠে বলল, "সে কী ! তুমি নিজের পোষা কুকুরকে লাথি মেরেছ ?"

"ঠিক লাথি মারিনি। পা দিয়ে আটকাতে গিয়েছিলাম।"

"পা দিয়ে ? কেন, মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে পারোনি ?"

"ও কথা শুনছিল না। তেড়ে তেড়ে আমাদের আত্মীয়কে কামড়াতে আসছিল। ...."

"কামড়েছে, বেশ করেছে। পোষা কুকুরের নাকে কেউ খোঁচা মারে? নতুন লোক বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করলে কুকুর তো বাধা দেবেই। সেই লোকদের উচিত কুকুরকে সমীহ করা। যাকগে, যা হবার হয়ে গেছে। বোঝাই যাচ্ছে যে, তোমার কুকুরের খুব অভিমান হয়েছে তোমার ওপর। যে-কুকুরের মার খাবার অভ্যেস নেই, তাকে একটু মারলেই সে ভীষণ দুঃখ পায়।"

"ও আর ফিরে আসবে না?"

"নিশ্চয়ই আসবে। পোষা কুকুর, বিশেষত এই সব ভাল জাতের কুকুর তার মালিককে ছেড়ে কক্ষনো যায় না। এসব হচ্ছে ওয়ানম্যান ডগ। এরা নিজেরা খাবার জোগাড় করে খেতেই শেখে না। তবে দুটো বিপদ আছে। হঠাৎ গাড়ি চাপা পড়তে পারে। কিংবা অন্য কুকুর আক্রমণ করতে পারে।"

"আমার কুকুরের সঙ্গে অন্য কোন কুকুর গায়ের জোরে পারবে না।"

"কোনো একটা কুকুর হয়তো পারবে না। কিন্তু একসঙ্গে আট-দশটা কুকুর যদি ঘিরে ধরে? কলকাতার রাস্তার নেড়ি কুত্তাদের তুমি চেনো না। ওদের দারুণ বুদ্ধি। একতাও আছে খুব। এমনি সময় নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করে, কিন্তু বাইরের কুকুর দেখলেই সবাই এক হয়ে যায়। দশটা কুকুর ঘিরে ধরলে একটা হাতিও কাবু হয়ে যেতে পারে।"

সুজয় হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গেল। তার মাথাটা ঝিমঝিম করে উঠল। সে চোখ বুজল, অমনি দেখতে পেল যে, একটা মাঠের মধ্যে একটা বড় দেবদারু গাছ, তার নীচে দাঁড়িয়ে আছে ডুংগা আর তাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আট-দশটা নেড়ি কুকুর। সেই কুকুরগুলো খুব জোরে জোরে ডাকছে, শুধু ডুংগা ডাকছে না। মাঠের ওপাশে পর পর তিনটে সাদা রঙের একতলা

বাড়ি।

সুজয় উঠে দাঁড়িয়ে বলল, "আমি যাই!"

রবি বলল, "একটু খুঁজে দেখো, পেয়ে যাবে। যতই অভিমান হোক, পোষা কুকুর তার মালিককে ছেড়ে বেশি দূর যায় না। তোমার বাড়ির দেড় মাইল রেডিয়াসের মধ্যেই ও থাকবে। এই সব কুকুর যখন পালায়, তখন সোজা ছোটে এক রাস্তা ধরে। হঠাৎ-হঠাৎ এদিক-ওদিক বেঁকে না। কাল সন্ধেবেলা এক ডালমাশিয়ান কুকুরকে আমি আনোয়ার শা রোডের দিকে ছুটে যেতে দেখেছি। তুমি ঐ দিকটা খুঁজে দেখো।"

সুজয়কে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে এল রবি। তারপর খুব নরম গলায় বলল, "পোষা কুকুর হারালে কত কষ্ট হয় আমি জানি। আমাদের একটা কুকুর একবার অ্যাকসিডেন্টে মরে গিয়েছিল। ওঃ, তিনদিন আমি ভাত খেতে পারিনি। আমিও তোমার সঙ্গে কুকুরটা খুঁজতে যেতাম, কিন্তু আমার বাবা দিল্লী থেকে আজ একটু বাদেই ফিরবেন, সেই সময় আমি বাড়িতে না থাকলে মুশকিল হবে। তোমাদের বাড়ির ঠিকানাটা বলো তো, আমি কাল খবর নিয়ে আসব!"

রবিকে ঠিকানাটা বলে দিয়ে সুজয় এগিয়ে গেল সামনের দিকে। খানিকটা গিয়েই আবার থমকে দাঁড়াল। বাড়িতে কারুকে কিছু বলে আসেনি সুজয়। এতক্ষণে নিশ্চয়ই মাস্টারমশাই এসে বসে আছেন। জানতে পারলে বাবা বকুনি দেবেন খুব। কিন্তু রবি নামে ঐ লোকটা যে বলল, ডুংগা দেড় মাইল রেডিয়াসের মধ্যেই থাকবে। যদি ডুংগা কাছাকাছি কোথাও চুপ করে বসে থাকে? একদম ডুংগাকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফিরলে মা নিশ্চয়ই খুশি হবেন। বাবাও বকবেন না। বাবা নিজেই তো সকালে থানায় ফোন করেছিলেন!

আনোয়ার শা রোড কাছেই। সুজয় ঠিক করল, অন্তত সেই পর্যন্ত খুঁজে আসবে। সেখানেও না পেলে, এক ছুটে বাড়ি।

সোজা রাস্তা ধরে আনোয়ার শা রোড পর্যন্ত হেঁটে এল সুজয়। ডুংগার কোনো পাত্তা নেই। এবার কোন্ দিকে ? কুকুর সোজা ছোটে, কিন্তু রাস্তা বেঁকে গেলে, সেখানে তো বেঁকতে হবেই। তাহলে ডানদিকে না বাঁ দিকে ? সুজয় রাস্তাটার দু' দিকে তাকাল। যদিও বাঁ দিক দিয়ে গেলে তার বাড়ি ফেরা সহজ হয়, তবু তার মনে হল ডান দিকেই যেতে হবে।

খানিকটা গিয়েই সুজয় অবাক হয়ে থমকে দাঁড়াল ! পাশে একটা ফাঁকা মাঠ, মাঝখানে একটা দেবদারু গাছ, মাঠের ওপাশে পরপর তিনখানা সাদা একতলা বাড়ি। ঠিক এই জায়গাটার ছবি একটু আগে চোখ বুজে দেখতে পেয়েছিল সুজয়। কেন দেখেছিল ? জায়গাটা তার খুব অচেনা নয়। এপাশ দিয়ে সে কয়েকবার গেছে। টালিগঞ্জে তার মাসীর বাড়ি যেতে হলে এই রাস্তা দিয়ে শর্টকাট হয়। কিন্তু চোখ বুজে এই মাঠটার ছবিই দেখেছিল কেন ? নিশ্চয়ই এখানে ডুংগা এসেছিল। মাঠটা অন্ধকার, তবু তার মধ্যে তাকিয়ে মনে হল, দেবদারু গাছটার নীচে একটা কুকুর শুয়ে আছে।

সুজয় দৌড়ে চলে এল সেখানে। কিন্তু সেটা ডুংগা নয়, একটা নেড়ি কুত্তা। সুজয়কে দেখেই কুকুরটা লেজ গুটিয়ে পালাল। তবু সুজয়ের ধারণা হল, খানিকটা আগে ডুংগা ছিল এখানে। ইশ, কেন সে একটু আগে আসেনি !

গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সুজয় চোখ বুজল আবার। প্রত্যেকদিন হয় না, কিন্তু এক-একদিন এমন হয়, সে চোখ বুজলেই কিছু-না-কিছু দেখতে পায়, ঠিক সিনেমার ছবির মতন। প্রথমে সে দেখলে একটা রোড রোলার। নতুন রাস্তা তৈরি করার

সময় যে দারুণ ভারী লোহার গাড়ি চালানো হয়, সেই রকম একটা রোড রোলার একটা রাস্তার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। অনেক সময় এই রোড রোলার সারা রাত রাস্তায় পড়ে থাকে। এত ভারী গাড়ি কেউ তো আর ঠেলেঠুলে চুরি করে নিয়ে যেতে পারে না। কিন্তু সুজয় হঠাৎ একটা রোড রোলার দেখছে কেন? মানে বুঝতে পারল না। তারপরেই দেখল, একটা রেল স্টেশন, হাওড়া কিংবা শিয়ালদার মতন বড় নয়, ছোট, প্রায় ফাঁকা। একটা ট্রেন ঝমঝম করে চলে গেল। এ-ছবিটার মানে বুঝল না সুজয়। তারপর সে দেখল, তার পড়ার ঘর, মাস্টারমশাই একা চেয়ারে বসে চা খাচ্ছেন, আর একটা বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছেন। বইটার নাম 'চাঁদের পাহাড়'। মাস্টারমশাই খুব ঠাণ্ডা লোক, একটু দেরি হলেও রাগ করবেন না। বইটা একবার পড়তে শুরু করলে শেষ না করে ছাড়তেও পারবেন না মাস্টারমশাই। তারপর সে দেখল, একটা নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আছে দুজন লোক। একজন খুব লম্বা, আর একজন বেঁটে। আরে এই তো সেই লোক দুটো, সেবার অজন্তা গুহা দেখতে গিয়ে দেখা হয়েছিল ওদের সঙ্গে! লোক দুটো তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আবার ফিরে এসেছে?... আবার সে দেখল, রোড রোলারটাকে। সেটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে একজন লোক একটা রিকশাওয়ালাকে জিগ্যেস করল, ভাই, নর্থ রোড কাঁহা হ্যায়? রিকশাওয়ালা বলল, এ হি তো নর্থ রোড! আবার সে দেখল, অন্য কোনো একটা রাস্তা দিয়ে পর পর অনেকগুলো কুকুর ছুটে যাচ্ছে। সব ভাল ভাল কুকুর, কিন্তু কোনোটাই ডুংগা নয়!

সুজয় চোখ খুলে ফেলল। তার কপালের মধ্যে টিপটিপ করছে। এই সব ছবি যখন সে দেখে, তখন তার শরীরটা খুব দুর্বল লাগে। কিন্তু এবার তো সে ডুংগাকে দেখতে পেল না।
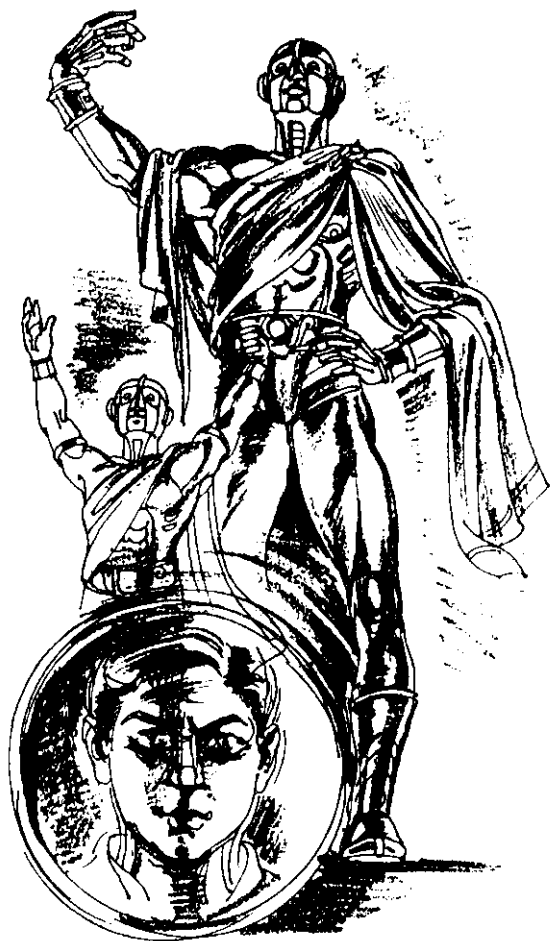
তাহলে আর কোথায় খুঁজবে ? সে রোড রোলারের কথাটাই ভাবতে লাগল। ওটা দেখল কেন ? আর যেগুলো দেখেছে, সেগুলো কোন্‌টা কোন্‌ জায়গায় তার ঠিক নেই। কিন্তু নর্থ রোড তো যাদবপুরে। এখান থেকে বেশি দূরে নয়। সত্যিই সেখানে একটা রোড রোলার আছে এখনো ? ঐ রাস্তায় তো সুজয় এক বছরের মধ্যে যায়নি। তবু ঐ রাস্তায় একটা রোড রোলারের ছবি তার চোখে ভেসে উঠবে কেন ?

যদিও অনেক দেরি হয়ে গেছে, তবু সুজয়ের মনে হল, নর্থ রোডে নিশ্চয় একবার দেখে আসতে হবেই। একদিন না হয় বকুনি খাবে। সাদা বাড়িগুলোর পাশ দিয়ে একটা সোজা রাস্তা বেরিয়ে গেছে, সেটা দিয়ে গেলেই যাদবপুরের কাছে পৌঁছনো যাবে।

নর্থ রোডে ঢুকে সুজয় দেখল, সে রাস্তাটা সারানো হচ্ছে। আর রাস্তার মাঝামাঝি থেমে রয়েছে একটা রোড রোলার। সুজয়ের বুকের মধ্যে ভূমিকম্পের মতন হতে লাগল। আরও দু-একবার এরকম মিলেছে। কিন্তু যতবারই তার চোখ-বুজে-দেখা ছবিটা পরে সত্যি-সত্যি মিলে যায়, তার এইরকম বুক কাঁপে।

রোড রোলারটা ঘিরে রয়েছে চার পাঁচটা নেড়ি কুকুর, তারা অশ্রান্তভাবে ডাকছে। আর রোড রোলারটার ওপরে সাদা সাদা রঙের কী একটা বসে আছে। ঐ তো ডুংগা ! সুজয়ের সারা শরীরের ওপর দিয়ে যেন একটা আনন্দের ঝর্ণা বয়ে গেল। ডুংগা যেন তার নিজের ভাই, কিংবা খুব প্রিয় বন্ধু। ডুংগাকে ছেড়ে সে থাকতে পারছিল না।

রাস্তায় অনেক খোয়া ইঁট পড়ে ছিল। একটা ইঁটের টুকরো তুলে নিয়ে সে নেড়ি কুত্তাগুলোর দিকে ছুঁড়ে মারল। কয়েকটা কুকুর ভয় পেয়ে পালাল, কয়েকটা তেড়ে এল সুজয়ের দিকে।

সুজয় এসব কুকুরকে ভয় পায় না। সে আর একটা ইঁট হাতে তুলে নিয়ে বলল, ভাগ্, ভাগ্। তারপর রোড রোলারটার দিকে এক পা এক পা করে এগোতে লাগল। তারপর সেটার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বলল, "ডুংগা, আয় আয় !"

ডুংগা মুখ তুলে একবার দেখল সুজয়কে। চোখে চোখ রাখল। তারপর তড়াক করে লাফিয়ে নেমে সামনের দিকে খুব জোরে দৌড় মারল।

সুজয় অবাক। ডুংগা তাকে দেখেও পালাচ্ছে ? ডুংগা এখনো অভিমান করে আছে ? কিংবা তার হাতে ইঁটটা দেখে কি ডুংগা ভেবেছে যে, তাকে মারতে এসেছে সুজয় ? না না, ডুংগা, তোকে কি আমি মারতে পারি ? তোকে আর কোনোদিন আমি মারব না, তুই বুঝিস না, তোকে আমি কতটা ভালবাসি ? আয়, আয়, ডুংগা।

ইঁটের টুকরোটা ফেলে দিয়ে সুজয় ডুংগার পেছনে পেছনে ছুটল।

ডুংগা বড় রাস্তায় পড়ে একবার ফিরে তাকিয়ে সুজয়কে দেখল। সুজয় প্রাণপণে ডাকল, "আয় ডুংগা, আয় !"

ডুংগা মুখ ঘুরিয়ে দৌড়ল গড়িয়ার দিকে। তারপর চলল এক লুকোচুরি খেলা। এক-এক সময় সুজয় ডুংগাকে দেখতে পায় না। তবু সে দৌড়য়। তারপর খানিকবাদে দেখে, ডুংগা থমকে দাঁড়িয়ে মাটিতে গন্ধ শোঁকে। তারপর মুখ ফিরিয়ে সুজয়কে দেখেই আবার দৌড়য়। সুজয়ের দারুণ ভয় হল। রাস্তা দিয়ে বড় বড় ট্রাক, বাস, গাড়ি যাচ্ছে। মিনিবাস ছুটছে দৈত্যের মতন। ডুংগা যে-কোনো সময় চাপা পড়ে যেতে পারে। সুজয় তো এখন ডুংগাকে ছেড়ে চলে যেতেও পারবে না। চোখের সামনে ডুংগাকে দেখেও সে কি ফিরে যেতে পারে ? এখন

বাড়িতে গেলে মা-বাবাই বলবেন, "কী রে, তুই এত বোকা ? ডুংগাকে অতদূরে ছেড়ে রেখে চলে এলি ?"

একটা মিনিবাস আর-একটা মিনিবাসকে ওভারটেক করতে গিয়ে সারা রাস্তা জুড়ে ফেলল। আর সেই দুটো বাসের মাঝখানে ডুংগাকে পড়ে যেতে দেখে সুজয় আঁতকে উঠল। সে চিৎকার করে উঠল, "এই, রোক্‌কে, রোক্‌কে !" কিন্তু মিনিবাসের গাঁক গাঁক আওয়াজের মধ্যে সুজয়ের চিৎকার শোনাই গেল না।

ডুংগা চাপাই পড়ত, কিন্তু একটা মিনিবাস ঠিক সময়ে ক্যাঁ-চ করে ব্রেক কষল। বাস দুটোর মাঝখান দিয়ে সাঁ করে বেরিয়ে গেল ডুংগা। রাস্তার একজন লোক বলল, "বাঃ, বেশ সুন্দর কুকুরটা তো !" সুজয় বলল, "ওটা আমার কুকুর।" লোকটি বলল, "ধরো, ওরকমভাবে কেউ কুকুরকে ছেড়ে দেয় ?" সুজয়ের আর উত্তর দেবার সময় নেই। সে এখন ডুংগার খুব কাছে এসে পড়েছে। আর-একটু হলেই ধরে ফেলবে। রাস্তার উল্টোদিক থেকে সুজয়ের ছোট মামার বয়সী দুটো লোক আসছিল, সুজয় চেঁচিয়ে বলল, "ধরুন, ধরুন, কুকুরটাকে ধরুন !"

একজন লোক 'আঃ আঃ চুঃ চুঃ' বলে হাত বাড়াতেই ডুংগা দু' পায়ে খাড়া হয়ে এমন প্রচণ্ড জোরে ডাঁউ ডাঁউ করে ডাকল যে, লোকটা ভয় পেয়ে পিছোতে গিয়ে একেবারে নর্দমায় পড়ে যাচ্ছিল ! তারপর ডুংগা আরও জোরে প্রায় ইলেকট্রিক ট্রেনের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল !

সুজয় হাঁপাতে হাঁপাতে একবার থমকে দাঁড়াল। দুঃখে তার চোখ ফেটে জল বেরিয়ে আসছে। সে কী করবে ? বাড়ি ফেলে কতদূরে চলে এসেছে। এতক্ষণ দৌড়ে তার প্রায় দম আটকে আসছে। এখন সে কী করবে ? ডুংগাকে ছেড়ে ফিরে যাবে ? তা কখনো হয় ? তার নিজের কোনো ভাই যদি বাড়ি থেকে রাগ করে

পালাত তবে সে কি তাকে একলা ছেড়ে নিজে ফিরে যেতে পারত ?

না, তা হয় না। ডুংগাকে ধরতেই হবে। ডুংগাকে এখন আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু রবি বলেছিল, কুকুরেরা সোজা ছোটে। এর মধ্যে ডুংগা ডান দিক বাঁ দিকের কোনো গলির মধ্যে ঢোকেনি। সেরকম কোনো গলিতে লুকোলে সে আর ডুংগাকে খুঁজেই পেত না।

সুজয় আবার ছুটল সামনের দিকে। গড়িয়ার মোড়ের কাছটায় সে একবার ডুংগাকে দেখতে পেল। আবার ডুংগা মিলিয়ে গেল। সুজয় তবু ছুটছে। রাস্তার দু' পাশে আর বাড়ি-ঘর নেই। রাস্তাটা অন্ধকার। মাঝে মাঝে গাড়ির আলো। দূরে কোথায় যেন একসঙ্গে অনেকগুলো কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে।
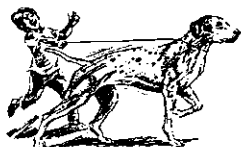
মাস্টারমশাই 'চাঁদের পাহাড়' বইটা পড়ে ফেললেন এক ঘন্টার মধ্যে। তারপর ঘড়ি দেখলেন। সুজয় এখনো এল না। এবার তিনি দু'বার গলা খাঁকারি দিলেন।

তখন দোতলা থেকে সুজয়ের মা ওঁদের চাকরকে ডেকে বললেন, "এই রঘু, মাস্টারমশাইকে চা দিসনি ?"

রঘু চা নিয়ে আসতেই মাস্টারমশাই বললেন, "একটা দেশলাই নিয়ে আয় তো রঘু !"

রঘু দৌড়ে গিয়ে দেশলাই নিয়ে এল। মাস্টারমশাই জিগ্যেস করলেন, "কী রে, তোর দাদাবাবু কোথায় গেল ?"

রঘু বলল, "জানি না তো ! বোধহয় কুকুর খুঁজতে গেছেন ।"

মাস্টারমশাই বললেন, "কুকুর ? কেন কুকুরের কী হয়েছে ?"

"কুকুরটা কাল সন্ধে থেকে পালিয়েছে ।"

মাস্টারমশাই একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন । যাক, বাঁচা গেছে । তিনি একদম কুকুর পছন্দ করেন না । যদিও সুজয়ের কুকুর তাঁকে চিনে গেছে, দেখলে তেড়ে আসে না, তবু ঐ কুকুরের চোখের দিকে তাকালেই গা ছমছম করে । মানুষ যে কেন শখ করে এরকম একটা হিংস্র জানোয়ার বাড়িতে পোষে ! আর সুজয়ের কুকুর তো ঠিক একটা চিতা বাঘের মতন ।

মাস্টামশাই বললেন, "কিন্তু কুকুরের জন্য যে আজকের পড়া নষ্ট হল ?"

রঘু বলল, 'তা তো হলই !"

"দাদাবাবুর মা জানেন যে, ছেলে এখনো ফেরেনি ?"

"মা তো ভবানীপুরে গিয়েছিলেন । এই মাত্র এলেন !"

"দেখো বাপু, কোনো ছাত্রের নামে তার বাবা-মার কাছে নালিশ করা আমি পছন্দ করি না ।"

"মাকে ডেকে আনব ?"

"না, না, না, না, না ! আমি চলে গেলে তারপর যা বলার তুমি বলবে ! আমরা যখন ছোট ছিলাম, তখন আমরাও দু-একদিন পড়াশুনোয় ফাঁকি দিয়েছি । মাস্টার হয়েছি বলে তো আর সে সব কথা ভুলে যেতে পারি না !"

"আপনি আর থাকবেন না ?"

"না । এর পর তোমার দাদাবাবু ফিরলেও আর পড়াশুনোয় মন থাকবে না । একদিন পড়াশুনো না করলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উল্টেও যাবে না । সুতরাং আমি যাই । কিন্তু আমি তিনতলা থেকে নামবার সময় যদি তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় আমার ?"

"মায়ের ঘরের দরজা বন্ধ।"

"দরজা বন্ধ ? বাঃ ! তাহলে আমি যাই ? শোনো, তোমার মা যদি জিগ্যেস করেন, মাস্টারমশাই কি রাগ করে চলে গেলেন, তখন তুমি কী বলবে ? তুমি বলবে, না, না, মাস্টারমশাই হাসি-হাসি মুখ করে গেছেন। বুঝলে ? আর তোমার দাদাবাবু ফিরে এলে বলবে, কাল এসে আমি দু'দিনের পড়া এক সঙ্গে পড়াব।"

এরপর মাস্টারমশাই সত্যিই হাসি-হাসি মুখ করে পা টিপে টিপে নীচে নেমে গেলেন। আজ কুকুরটা নেই বলে তিনি গেটের সামনে হেঁটে গেলেন বেশ সাহসের সঙ্গে।

সুজয়ের মা সন্ধেবেলা এক আত্মীয়ের বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসে কিছুক্ষণ একটা মাসিক পত্রিকা পড়লেন। তারপর ঘড়িতে যখন দেখলেন সাড়ে ন'টা বাজে তখন রঘুকে ডেকে বললেন, "বাবুর আজ ফিরতে দেরি হবে। খাবার টেবিলে প্লেট সাজিয়ে দে।" তারপর জিগ্যেস করলেন, "হ্যাঁরে, মাস্টারমশাই কি আজ এখনো পড়াচ্ছেন নাকি ?"

রঘু বলল, "মাস্টারমশাই কাকে পড়াবেন ? দাদাবাবুই তো ফেরেনি !"

"দাদাবাবু ফেরেনি ? তা হলে অনেকক্ষণ থেকে যে দেখছি, তিনতলার ঘরে আলো জ্বলছে !"

"সে তো মাস্টারবাবু নিজেই পড়াশুনো করছিলেন।"

"জয় ফেরেনি ? সে-কথা এতক্ষণ আমায় বলিসনি কেন ?"

"মাস্টারবাবু যে বারণ করলেন বলতে !"

"বারণ করলেন ? কেন ?"

"তা জানি না। মাস্টারবাবু রাগ করেননি, হাসি-হাসি মুখ করে চলে গেছেন।"

"কী আবোল-তাবোল বকছিস ? জয় এখনো ফেরেনি মানে ? এত রাত পর্যন্ত সে কোথায় থাকবে ?"

মায়ের ভুরু কুঁচকে গেল।

বাবা ফিরলেন সাড়ে দশটায়। শুনেই তিনি মাকে বললেন, "আজকাল তুমি ছেলেকে বড্ড বেশি আশকারা দাও। দিন দিন কথার অবাধ্য হচ্ছে। এখনো চোদ্দ বছর বয়েস হয়নি, এর মধ্যেই ছেলে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত বাড়ির বাইরে থাকবে ?"

মা বললেন, "না না, কুকুর। ডুংগা ফেরেনি তো, নিশ্চয়ই তাকে খুঁজতেই..."

বাবা বললেন, "সেইজন্যই তো বারণ করেছিলাম কুকুর পুষতে। কুকুরের জন্য পড়াশুনোও নষ্ট হবে!"

বাবা তক্ষুনি থানায় ছুটলেন।

থানার দারোগাবাবু প্রথমেই জিগ্যেস করলেন, "ছেলের বয়েস কত? পরীক্ষায় ফেল করেছে? কিন্তু এই সময় তো পরীক্ষা-টরিক্ষা কিছু নেই!"

বাবা গম্ভীর ভাবে বললেন, "ছেলের বয়েস সাড়ে তের। সে পরীক্ষায় সেকেণ্ড-থার্ড হয়।"

দারোগাবাবু হেসে বললেন, "আরে মশাই, ছেলে ফেল করলেও

যেমন মা-বাবা বকে, তেমনি সেকেন্ড-থার্ড হলেও কেন ফার্স্ট হয়নি সেই জন্য দারুণ বকুনি দেয়। আজকাল এত বাড়াবাড়ি শুরু হয়েছে !"

বাবা বললেন, "না, তাকে বকুনিও দেওয়া হয়নি।"

"তা হলে দেখুন, নিশ্চয়ই কোনো বাজে বন্ধু-টন্ধুর পাল্লায় পড়েছে।"

"তা-ও নয়। আমাদের বাড়ির কুকুর হারিয়ে গেছে, সেটাকে খুঁজতে বেরিয়েছিল !"

"কুকুর খুঁজতে গেছে ? তা হলে আর কী করা যাবে !"

"সে কী, কিছুই করার নেই ?"

"দেখুন, খুব ছোট ছেলে তো নয় যে রাস্তা হারিয়ে ফেলবে ! খুব ছোট ছেলেমেয়ে রাস্তায় হারিয়ে গেলে লোকে থানায় এসে জমা দিয়ে যায়। এত বড় ছেলের আর কী বিপদ হবে ! বাড়িতে গিয়ে দেখুন, এতক্ষণে নিশ্চয়ই ফিরে এসেছে।"

"যদি না ফেরে ?"

"তাহলে কাল কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন, 'খোকা ফিরিয়া এসো। মা শয্যাশায়ী। টাকার দরকার থাকিলে জানাও পাঠাইব !' দেখবেন তাতেই ফিরে আসবে ঠিক।"

বাবা উঠে দাঁড়াতেই দারোগাবাবু বললেন, "বেশি চিন্তা করবেন না। আজকালকার ছেলেরা সহজে হারায় না। খুব চালু হয়। আমাদের দিক থেকে যা-যা ব্যবস্থা করবার করব ! বসুন, আপনার সামনেই ব্যবস্থা করছি।"

বাবা বাড়ি ফিরে আসতেই মা বললেন, "কী হল ? কিছু খবর পাওয়া গেল ?"

বাবা শুকনো মুখে সব বললেন, "সব ক'টা থানায় খবর দেওয়া

হয়েছে। আর কলকাতার সব হাসপাতালেও খোঁজ নিয়ে দেখা হল।"

মা বললেন, "অ্যাঁ ? হাসপাতালে ? কেন ?"

"যদি রাস্তায় কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়, তাহলে হাসপাতাল থেকেই খবর পাওয়া যাবে।"

অ্যাকসিডেন্টের কথা শুনেই মা কেঁদে ফেললেন। বাবা বললেন, "কান্নাকাটি শুরু করলে কেন ? তাতে কোনো লাভ হবে ? বরং ঠাণ্ডা মাথায় একটু চিন্তা করতে দাও !"

মা বললেন, "তুমি সুখেনকে নিয়ে লেকটা একবার দেখে এসো না !"

"এত রাত্রে সে লেকে কী করবে ?"

"যদি ঘুমিয়ে-টুমিয়ে পড়ে !"

"যত্ত সব অদ্ভুত কথা। কোনো বাড়ির ছেলে সন্ধে থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত লেকে ঘুমোয় ?"

বাবার হারুমামা ফিরলেন বারোটা বেজে কুড়ি মিনিটে। উনি কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল চেনেন না। বরানগরে একজন লোকের সঙ্গে দেখা করবেন বলে সুজয়ের ছোড়দি ঝর্নাকে নিয়ে গিয়েছিলেন সঙ্গে। ফেরার পথে একটা থিয়েটার দেখে এলেন।

বাড়িতে তখন মা দু' হাতে মুখ ঢেকে নিঝুম হয়ে বসে আছেন। মাঝে-মাঝে শরীরটা কেঁপে উঠছে। আর বাবা ফোন করে যাচ্ছেন অনবরত। খাওয়া-দাওয়া কিছুই হয়নি।

দু' তিনবার জুতো ধপধপিয়ে ধুলো ঝেড়ে তারপর বাবার হারুমামা জিগ্যেস করলেন, "কী ব্যাপার ?"

ঝর্না দৌড়ে মায়ের কাছে গিয়ে বলল, "মা, কী হয়েছে ?"

মা কিছু বললেন না, বাবা উত্তর দিলেন, "সুজয় বাড়ি ফেরেনি এখনো।"

"অ্যাঁ ?"

হারুমামা বললেন, "এখনো বাড়ি ফেরেনি ? রাত বারোটা বেজে গেছে ! আজকালকার ছেলেরা বড্ড অবাধ্য হয়েছে ! এত রাত হল—"

বাবা এবার একটু বিরক্তভাবে বললেন, "সে কোনোদিন এরকম করে না ! নিশ্চয়ই কিছু একটা বিপদ হয়েছে। কুকুরটা বাড়ি থেকে চলে গেছে, সেটাকে খুঁজতে গিয়েই..."

হারুমামা এবার হাসলেন। বললেন, "ও, কুকুরটাকে খুঁজতে গেছে ! সে কথা আগে বলতে হয় ! কিন্তু কুকুরটা পালাল কেন ? পোষা কুকুর তো বাড়ি থেকে কখনো পালায় না ! আমি কাল ওকে ছাতা দিয়ে মেরেছিলাম বলে পালিয়েছে ?"

মা, বাবা আর ঝর্না তিনজনেই চুপ করে রইল। মৌনং সম্মতি লক্ষণং। মুখ ফুটে না বললেও সবাই হারুমামাকেই কুকুরটা হারাবার জন্য দায়ী করেছে।

হারুমামা বললেন, "আমার খিদে পেয়েছে, খাবার দাও। আমি একটু বাদেই তোমাদের কুকুর খুঁজে দিচ্ছি।"

বাবা বললেন, "আপনি কোথায় কুকুর খুঁজবেন ? আপনি তো কলকাতার রাস্তাঘাট ভাল করে চেনেনই না !"

"সে তোমাদের চিন্তা করতে হবে না। আমি বাড়িতে বসেই কুকুর খুঁজে দেবো।"

অত রাত্তিরে আর কারুর খাবার ইচ্ছে নেই। তবু হারুমামা সবাইকে খাবার জন্য জোর করলেন। বাবা আর ঝর্না একটু একটু খেল, মা কিছুতেই একটুও খেতে রাজি হলেন না।

খাওয়া-দাওয়ার পর হারুমামা সবাইকে নিয়ে ছাদে উঠে এলেন। যে ছাতাটা দিয়ে তিনি ডুংগাকে মেরেছিলেন, সেটাকে দাঁড় করিয়ে রাখলেন ছাদের পাঁচিলের এক কোণে। তারপর

নিজে একটা আসন পেতে বসলেন। রঘু তার সামনে ঘুঁটে আর কাঠকয়লা দিয়ে আগুন জ্বেলে দিল।

হারুমামা প্রথমে সেখানে খানিকক্ষণ চোখ বুজে বসে রইলেন। তারপর একটু বাদে চোখ খুলে বললেন, "হ্যাঁ, হবে! আফ্রিকায় থাকবার সময় আমি দেখেছি, জুলুরা তাদের কোনো পোষা জন্তু-জানোয়ার হারিয়ে গেলে কিংবা কেউ চুরি করলে এই যজ্ঞটা করে। যদি কোনো কাজে লাগে এই ভেবে আমি সেটা শিখে নিয়েছিলাম। অনেকদিন প্র্যাকটিস নেই, তবু দেখলাম, মন্ত্রগুলো মনে আছে। কয়েকটা জিনিস লাগবে অবশ্য। খানিকটা কাঁচা মাংস, তাল গাছের কয়েকটা পাতা, একটুখানি কর্পূর, দশটা শুকনো লঙ্কা আর কয়েকটা গুটিপোকা!"

ফ্রিজে কাঁচা মাংস আছে, কর্পূর আর শুকনো লঙ্কাও আছে বাড়িতে। কিন্তু তালগাছের পাতা এখন কোথায় পাওয়া যাবে? আর গুটিপোকা?

"গুটিপোকা কী?"

হারুমামা বললেন, "তালগাছের পাতা আনতে পারবে না? গুটিপোকা নেই?"

বাবা বললেন, "গুটিপোকা আবার লোকের বাড়িতে থাকে নাকি? সে কোথায় পাওয়া যাবে? কাল সকালে না হয় গ্রাম-ট্রাম থেকে তালগাছের পাতা জোগাড় করা যেতে পারে। কিন্তু হারুমামা, এসব যজ্ঞে-টজ্ঞে আমার বিশ্বাস হয় না।"

হারুমামা বললেন, "বিশ্বাস যদি না করো, তাহলে আর চেষ্টা করে লাভ কী? তাহলে আমি উঠে পড়ি?"

মা বললেন, "না, না। আপনি চেষ্টা করুন। কিন্তু তালপাতা আর গুটিপোকা কোথায় পাব?"

হারুমামা বললেন, "হয়, হয়, সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়!"

ঝর্না বলল, "মা, আমাদের একতলার রান্নাঘরে একটা হাতপাখা আছে না ? হাতপাখা তো তালগাছের পাতা দিয়েই তৈরি হয় !"

হারুমামা বললেন, "এই তো, মেয়েটার বুদ্ধি আছে। নিয়ে এসো সেই হাতপাখা !"

"কিন্তু গুটিপোকা ?"

"বুদ্ধি থাকলে সব কিছুরই ব্যবস্থা হয়। বাড়িতে পুরনো সিল্কের শাড়ি নেই ? তার থেকে ছিঁড়ে খানিকটা নিয়ে এসো। গুটিপোকা থেকেই তো সিল্ক হয়।"

ঝর্না দৌড়ে চলে গেল হাতপাখা আর সিল্কের কাপড়ের একটা টুকরো আনতে।

সব কিছু পাবার পর হারুমামা বেশ গুছিয়ে বসলেন। প্রথমে আগুনের মধ্যে খানিকটা কাঁচা মাংস আর শুকনো লঙ্কা ফেলে দিতেই দারুণ ধোঁয়া আর বিচ্ছিরি গন্ধ হল। হারুমামা চেঁচিয়ে বললেন, "আকিলা ডিউই ডিউই নোকুমো লেসোথো উরুণ্ডি বুরুণ্ডি ডুংগা ডুংগা..."

হঠাৎ থেমে গিয়ে তিনি জিগ্যেস করলেন, "কুকুরটার গোত্র কী ?"

বাবা আর মা পরস্পরের মুখের দিকে তাকালেন। কুকুরের আবার গোত্র হয় নাকি ? কুকুরের পেডিগ্রি থাকে অবশ্য, কিন্তু সে-সব কে খোঁজ রেখেছে ?

ঝর্না চট করে বলল, "ডুংগার ডালমাশিয়ান গোত্র।"

হারুমামা বললেন, "ঠিক আছে। ওতেই হবে।"

শুকনো লঙ্কার ধোঁয়ায় সবাই কাসছে আর চোখ দিয়ে জল পড়ছে। হারুমামা বললেন, "শোনো, এই যজ্ঞ কিন্তু চলবে ঠিক সাড়ে তিনঘন্টা—ততক্ষণ কিন্তু সবাইকে জেগে থাকতে হবে। ঘুমোলে চলবে না।"

এবার তিনি আগুনে খানিকটা কর্পূর ফেলে দিলেন। তাতে শুকনো লঙ্কার ঝাঁঝটা একটু কমল। আবার খানিকক্ষণ সেই রকম অদ্ভুত মন্ত্র পড়ে তিনি হাতপাখাটা গুঁজে দিলেন আগুনে ? আবার বিশ্রী ধোঁয়া। এবার তিনি বকুনি দিয়ে বললেন, "কে ঘুমোচ্ছে ? যার ঘুম পাবে, সে নীচে চলে যাক।"

ঝর্নার একটু ঝিমুনি এসেছিল। সে তাড়াতাড়ি নড়েচড়ে বসে বলল, "না, না, আমি তো ঘুমোইনি !"

ঘুম তাড়াবার জন্য তিনি আরও তিন-চারটে শুকনো লঙ্কা ফেলে দিলেন আগুনের মধ্যে। আবার মন্ত্র পড়লেন, "আকিলা কাটাঙ্গাকিকুইট বাসাঙ্কুসু লুবুম্বাসি বাসাকো বোটসোয়ানা লুসাকা ডুংগা ডালমাশিয়ান..."

বাবা আস্তে আস্তে বললেন, "এ কেমন মন্ত্র ? এ তো মনে হচ্ছে কয়েকটা দেশের নাম..."

হারুমামা ধমক দিয়ে উঠলেন, "চুপ ! মাঝখানে কেউ কথা বলবে না..."

হারুমামা বলেছিলেন সাড়ে তিন ঘন্টা যজ্ঞ চলবে। কিন্তু তখনো এক ঘন্টাও হয়নি এমন সময় নীচে গেটের কাছে ডাঁউ ডাঁউ করে আওয়াজ হল।

ঝর্না সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠল, "ঐ তো !"

কারুর সন্দেহ রইল না যে, ওটা ডুংগারই ডাক।

সবাই হুড়োহুড়ি করে নেমে এল নীচে। সত্যিই তো, বন্ধ গেটের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ডুংগা। সে প্রচণ্ড জোরে ডাকছে। গেট খুলে দিতেই ডুংগা বাবার পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঘষতে লাগল।

কিন্তু সুজয় কোথায় ? সবাই রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেখতে

লাগল। না, সুজয় তো নেই কোথাও।

সুজয় ফেরেনি। ডুংগা একা এসেছে।

অন্ধকার রাস্তা দিয়ে ছুটতে-ছুটতে সুজয় আবার থমকে দাঁড়াল। সে এত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে যে, আর পারছে না। আবার এতটা রাস্তা তাকে ফিরে যেতে হবে। তার কাছে পয়সা নেই। ডুংগাকেও সে এভাবে কিছুতেই ধরতে পারবে না। ডুংগা তার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে। কুকুর যদি ইচ্ছে করে ধরা না দেয়, তা হলে মানুষ কি তাকে দৌড়ে ধরতে পারে? ডুংগা জানে, সুজয় রোজ এ সময় পড়তে বসে। তবু সে তাকে এতখানি দৌড় করাচ্ছে! ডুংগা আর তাকে ভালবাসে না। যাক, ডুংগা যেখানে খুশি যাক।

সুজয়ের দারুণ খিদে পেয়েছে। ডুংগারও খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই, সেও তো কিছুই খায়নি। ডুংগা শেখেইনি নিজের খাবার জোগাড় করতে। এইরকমভাবে পালিয়ে গেলে সে বাঁচবে? কোনো না কোনো বাড়িতে আশ্রয় নিতে হবে তাকে। এরকম একটা ভাল কুকুর পেলে কেউ ছাড়বে না। ডুংগার যেখানে খুশি সেখানেই থাকুক। ভাল থাকলেই হল।

ছেলেবেলায় সুজয় একটা বই পড়েছিল। হান্ড্রেড অ্যান্ড ওয়ান ডালমাশিয়ান। ওয়াল্ট ডিজনির বই। একদল গুণ্ডা শুধু ডালমাশিয়ান কুকুরই চুরি করত। তাদের মধ্যে ছিল একটা ডাইনীর মতন চেহারার মেয়ে। তারা ঐ ডালমাশিয়ান কুকুরগুলো

মেরে তাদের চামড়া দিয়ে কোট বানাত। ডালমাশিয়ানের মতন এত সুন্দর চামড়া তো আর কোনো কুকুরের হয় না! ভুংগা যদি সে রকম কোনো চোরের দলের পাল্লায় পড়ে? যাক, সুজয় আর ভাবতে পারছে না। ভুংগাকে তো সে লাথি মারেনি। পা'টা শুধু লেগে গিয়েছিল জোরে। ভুংগা সেটা বুঝতে পারল না? তার জন্যে এত অভিমান?

একটা কালভার্টের ওপর বসে খানিকক্ষণ জিরিয়ে নিয়ে সুজয় একটু সুস্থির হল। রাত এখন ক'টা? আটটা, নটা? ইশ, সাঙ্ঘাতিক দেরি হয়ে গেছে। মা দারুণ চিন্তা করছেন নিশ্চয়ই। এখান থেকে ফিরতে আবার কতক্ষণ লাগবে কে জানে! রাস্তা হারাবার ভয় নেই। যে-রাস্তা দিয়ে এসেছে, ঠিক সেটা ধরেই ফিরে যাবে। কিন্তু আর দৌড়তে পারবে না।

কতটা দূরে সে চলে এসেছে? সুজয় অন্তত আড়াই ঘন্টা তিন ঘন্টা ধরে দৌড়েছে। আড়াই ঘন্টা ধরে ছুটে একজন মানুষ অন্তত পনেরো মাইল দূরে চলে যেতে পারে। তাদের ঢাকুরিয়া থেকে পনেরো মাইল দূরে কোন্ জায়গা? এখানে তো কোনো বাড়িঘর নেই!

তীব্র সার্চলাইট জ্বেলে একটা গাড়ি আসছিল দূর থেকে। গাড়িটা ঠিক সুজয়ের সামনে এসে থামল। গাড়ির ভেতর থেকে একটা হলদে রঙের টর্চের আলো এসে পড়ল তার গায়ে। আলোটা এতই জোরালো যে সুজয়ের চোখ ধাঁধিয়ে গেল, হাত দিয়ে সে চোখ আড়াল করল।

আলোটা নিভে গেল, কিন্তু ইঞ্জিনের ধক্ ধক্ শব্দ হচ্ছে, গাড়িটা দাঁড়িয়েই আছে।

সুজয়ের হঠাৎ একটা কথা মনে এল। সে তাড়াতাড়ি উঠে চলে এল গাড়ীটার সামনে। ভেতরে তিন চারজন লোক বসে

আছে, তাদের মুখগুলো দেখা যাচ্ছে না অন্ধকারে।

সুজয় বলল, "আপনারা কি সামনের দিকে যাচ্ছেন ?"

কেউ কোনো উত্তর দিল না।

সুজয় বলল, "আমার কুকুরটা ঐ দিকে গেছে। আপনারা আমাকে একটু এগিয়ে দিলে কুকুরটাকে ধরতে পারি।"

কট্ করে শব্দ হয়ে গাড়িটার একটা দরজা খুলে গেল। সুজয় আর চিন্তা না করে উঠে পড়ল গাড়িটার মধ্যে। গাড়িটা চলতে শুরু করল তক্ষুনি। সুজয় ভাবল, এবার ডুংগাকে সে ধরবেই ! কুকুর তো আর গাড়ির সঙ্গে ছুটে পারবে না।

গাড়িটাতে ড্রাইভার ছাড়া আরও তিনজন লোক বসে আছে। তিনজনেরই কালো রঙের পোশাক। চোখে কালো চশমা। এরা রাত্তিরবেলাতেও চোখে সানগ্লাস পরে আছে বলে সুজয়ের একটু খটকা লাগল। এদের সকলেরই কি কনজাংকটিভাইটিস নামে সেই চোখের অসুখটা হয়েছে ? গাড়িটা ছুটছে দারুণ জোরে।

সুজয় পাশের লোকটিকে জিগ্যেস করল, "আপনারা কি পুলিস ?"

লোকটি সুজয়ের চোখে চোখ রেখে হাসল। মুখে কিছু বলল না।

কেউ কথার উত্তর না দিলে বড্ড অস্বস্তি লাগে। কিন্তু এরা সুজয়কে গাড়িতে জায়গা দিয়েছে, সুতরাং এদের ওপর রাগ করা যায় না। সুজয় আবার বলল, "আপনাদের সকলেরই একরকম পোশাক কিনা, তাই জিগ্যেস করছিলাম।"

এবারও কোনো উত্তর দিল না কেউ।

বেশি দূর যেতে হল না। একটু পরেই সুজয় দেখতে পেল ডুংগাকে। তার চামড়ার সাদা রঙের জন্য অন্ধকারের মধ্যেও দেখা যায়।

ডুংগা রাস্তার ধারে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। গাড়িটা কাছে আসতেই খুব জোরে ডেকে উঠল। সুজয়ও সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, "ঐ তো ডুংগা। গাড়ি থামান!"

গাড়ির গতি একটুও কমল না। সুজয়ের গলার আওয়াজ পেয়ে ডুংগা ঝাঁপিয়ে পড়তে এল গাড়িটার ওপরে। আর সঙ্গে সঙ্গে গাড়ির ড্রাইভার স্টিয়ারিং ঘুরিয়ে ডুংগাকে চাপা দিতে গেল।

সুজয় বলল, "এ কী করছেন ? আমার কুকুর ! থামান।"

ড্রাইভার শুনল না তার কথা। সুজয় মুহূর্তের মধ্যে ভাবল, এরা বোধহয় বাংলা বোঝে না। সে আবার চেঁচিয়ে বলল, "স্টপ ! দিস ইজ মাই ডগ ! রোক্‌কে ! হামারা পোষা কুত্তা হ্যায় ! স্টপ ! স্টপ !"

ড্রাইভার তবু ডুংগাকে চাপা দেবার চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু ডুংগাকে চাপা দেওয়া সহজ নয়। সে এক একটা লাফ দিয়ে রাস্তার এধার থেকে ওধারে চলে যাচ্ছে আর প্রাণপণ শক্তিতে চ্যাচাচ্ছে। তার চোখ সুজয়ের দিকে।

একবার গাড়িটা প্রায় ডুংগাকে ছুঁয়ে ফেলল ; ডুংগা তখন পেছন ফিরে নেমে গেল মাঠের মধ্যে। গাড়িটাও তাকে তাড়া করে মাঠের মধ্যে নামতে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছনের সীট থেকে একজন ঝুঁকে পড়ে ড্রাইভারের কাঁধের ওপর চাপড় মারল। ড্রাইভার তখন গাড়ির মুখ সোজা করে নিল রাস্তার ওপর। তারপর চালিয়ে দিল সামনের দিকে ! দারুণ জোরে।

সুজয় বলল, "আমাকে নামিয়ে দিন। কোথায় যাচ্ছেন ? থামুন ! লেট মী গেট ডাউন।"

কেউ সুজয়ের কথায় কান দিল না।

সুজয় তখন গাড়ির দরজা খুলে লাফিয়ে পড়বার চেষ্টা করল। সঙ্গে সঙ্গে একজন হাত বাড়িয়ে চেপে ধরল তার ঘাড়। লোহার

মতন শক্ত সেই হাত। সুজয়ের আর নড়াচড়ার ক্ষমতা রইল না। তখনও সে শুনতে পাচ্ছে ডুংগার ডাক, ডুংগা তাড়া করে আসছে গাড়িটাকে। কিন্তু গাড়িটা ছুটছে অসম্ভব জোরে, রাস্তাটা ভাঙা, মাঝে-মাঝে বিরাট গর্ত, তার ওপর দিয়ে গাড়িটা যেন উড়ে চলেছে।

সুজয় যদিও বেশ ভয় পেয়ে গেছে, তবু গলা না-কাঁপিয়ে জিগ্যেস করল, "আপনারা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন ? আমি কী করেছি ?"

যে লোকটি সুজয়ের ঘাড় ধরেছিল, এবার সে জোর করে সুজয়ের মুখটা ফেরাল নিজের দিকে। সুজয় দেখল, লোকটির চোখ দিয়ে ঠিক টর্চের ফোকাসের মতন দু' ঝলক সবুজ আলো বেরুলো। সুজয় আর সহ্য করতে পারল না, অজ্ঞান হয়ে ঢলে পড়ল লোকটার কোলে।

এদিকে ডুংগা বেশ খানিকক্ষণ তাড়া করে এল গাড়িটাকে। কিন্তু একটু বাদেই সে আর গাড়িটাকে দেখতে পেল না। তখন ডুংগা রাস্তার মাঝখানে থমকে দাঁড়াল এক জায়গায়, আকাশের দিকে মুখ করে দুবার করুণ সুরে ডাকল। তারপর পেছন ফিরে সোজা ছুটল বাড়ির দিকে।

রতনলাল নামে একজন লোক শেয়াল তাড়া করতে বেরিয়েছিল। রোজই তার মুর্গীর ঘরে শেয়াল এসে উৎপাত করে। আজও একটা শেয়াল একটু আগে তার একটা মুর্গী মুখে করে পালিয়েছে। তাই রেগেমেগে রতনলাল একটা লাঠি নিয়ে

বেরিয়েছে শেয়াল মারবে বলে। বড় রাস্তার ওপরে একটা জলামতন জায়গা আর বাঁশবন আছে, শেয়ালগুলো সেখানে পালায়।

রতনলাল বড় রাস্তার কাছে এসে দেখল, সেখানে একটা গাড়ি থেমে আছে আর কতকগুলো নেড়ি কুকুর সেই গাড়িটা ঘিরে দাঁড়িয়ে চ্যাঁচাচ্ছে। রতনলাল একটু অবাক হয়ে গেল। এত রাত্রে এখানে একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কেন ? খারাপ হয়ে গেছে গাড়িটা ?

সে গাড়িটার কাছে এসে উঁকি মারল। ভেতরে কালো পোশাক পরা চারজন লোক বসে ব্যস্ত হয়ে কী যেন করছে। রতনলাল জিগ্যেস করল, "কী দাদা, কী হয়েছে ? ঠেলতে হবে ?"

কেউ কোনো উত্তর দিল না। গাড়ির ভেতর থেকে একটা শক্ত কালো হাত বেরিয়ে এসে তাকে একটা ধাক্কা দিল খুব জোরে। রতনলাল ছিটকে পড়ে গেল মাটিতে। তার যত না ব্যথা লাগল, তার চেয়ে সে অবাক হল আরও বেশী ! এ কী রে বাবা ! এরকম শুধু-শুধু কেউ মারে ?

রতনলাল বেশ সাহসী লোক, গায়েও জোর আছে। মাটি থেকে উঠে লাঠিখানা বাগিয়ে ধরে আবার এগিয়ে এল। কড়া গলায় জিগ্যেস করল, "আমায় মারলেন কেন ? এ কি মামদোবাজি নাকি ? আমাদের গাঁয়ের মধ্যে এসে..."

রতনলালের কথা মাঝ-পথে থেমে গেল। গাড়ির একটা লোক দরজা খুলে বেরিয়ে রতনলালের ঘাড়টা চেপে ধরল, তারপর তাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিল অনেক দূরে।

রতনলাল এবার ভয় পেয়ে গেল সাঙ্ঘাতিক। মাঠের মধ্যে কাদার মধ্যে পড়েছে বলে তার হাত-পা ভাঙেনি। সে কোনো রকমে উঠেই বাবা রে, মা রে, মেরে ফেললে রে বলে চিৎকার

করে দৌড়ল বাড়ির দিকে।

গাড়ির লোকগুলো এসব কিছু গ্রাহ্যও করল না। তাদের একজন কোলের ওপর শুইয়ে নিয়েছে সুজয়কে। একজন একটা হলদে আলোর টর্চ জ্বেলে রেখেছে। আর-একজন গাড়ির সামনে থেকে বার করল একটা করাতের মতন ছোট যন্ত্র। সেটা সুজয়ের গলার কাছে এনে ধরতেই ইলেকট্রিক যন্ত্রের মতন সেটা থেকে খররর্ খররর্ আওয়াজ বেরুতে লাগল। তারপর মাখনের মধ্যে যেমন খুব সহজেই ছুরি ডুবে যায়, সেইরকমভাবে ঐ করাতটা কেটে ফেলল সুজয়ের গলা। তার কাটা মুণ্ডুটা রাখা হল সীটের ওপর। খুব বেশি রক্তও বেরুলো না, কারণ গলাটা কাটার পরই একজন দু'দিকে লাগিয়ে দিল খানিকটা মলম। তাতে রক্ত বন্ধ হয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে।

এরপর করাত দিয়ে তারা সুজয়ের দুটো হাত আর দুটো পাও কেটে ফেলল খুব তাড়াতাড়ি। সেগুলোও রেখে দিল সীটের ওপরে। তারপর শুধু সুজয়ের ধড়টা উঁচু করে তুলে ধরল। একজন ছিঁড়ে ফেলতে লাগল সুজয়ের বুকের কাছের জামা। আর যে-লোকটার হাতে করাত ছিল, সে সেটা রেখে দিয়ে আর-একটা লম্বা তুরপুনের মতন যন্ত্র বার করল।

এই সময় একটা হৈ হৈ শব্দ শোনা গেল দূরে। রতনলাল গ্রাম থেকে লোকজন জুটিয়ে নিয়ে তাড়া করে আসছে। প্রায় তিরিশ চল্লিশজন লোক।

গাড়ির লোক চারটে নিজেদের মধ্যে চোখাচোখি করল একবার। তারা খুব বিরক্ত হয়েছে। যেন তারা খুব একটা দরকারি অপারেশান করছিল এমন সময় একটা বাধা পড়েছে। তখন একজন ঝুঁকে ড্রাইভারের গায়ে চাপড় মারতেই ড্রাইভার চালিয়ে দিল গাড়িটা। সামনে কয়েকটা নেড়ি কুত্তা তখনও

চ্যাঁচাচ্ছিল, ড্রাইভার গ্রাহ্যও করল না, তাদের ওপর দিয়েই চালিয়ে দিল গাড়ি। দুটো কুকুর চাপা পড়ে মরল। দু-এক মিনিটের মধ্যে গাড়িটা চলে গেল অনেক দূরে।

যতক্ষণ গাড়িটা চলতে লাগল, ততক্ষণ গাড়ির লোকগুলো সুজয়ের কাটা হাত-পাগুলো তুলে নিয়ে দেখতে লাগল খুব মনোযোগ দিয়ে। সুজয়ের বাঁ হাতের মাঝের আঙুলে একটা পলার আংটি ছিল। একজন টেনে-টেনে খুলে ফেলল সেই আংটিটা। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখল সেটাকে। তারপর খুব জোরে চাপ দিতেই মট করে ভেঙে গেল সোনাটা, আর পলাটা খসে পড়ল। লোকটা সেই পলাটা টুপ করে মুখে পুরে দিয়ে চুষতে লাগল লজেন্সের মতন।
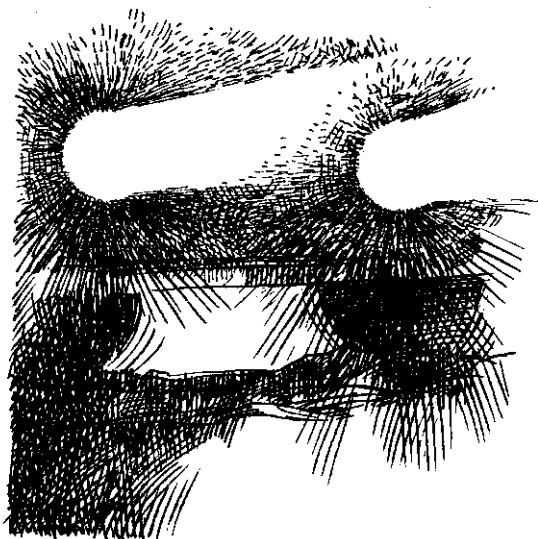
খানিকটা দূরে একদম ফাঁকা জায়গা দেখে গাড়িটা থামল। আবার একজন টর্চ জ্বেলে রইল, একজন সুজয়ের ধড়টা তুলে ধরল উঁচু করে। অন্য লোকটা তুরপুনের মতন যন্ত্রটা বাগিয়ে নিল সুজয়ের বুকের কাছে।

কিন্তু এবারও বাধা পড়ল। খুব জোর হেডলাইট জ্বেলে উল্টো দিক থেকে একটা গাড়ি আসছে। একটা ট্রাক। এই গাড়ির লোকজনরা চুপ করে বসে রইল একটু। ট্রাকটা পার হয়ে গেলেও

আবার হেডলাইটের আলো। আরো ট্রাক আসছে, খানিকটা দূরে দূরে পর পর সাত-আটটা।

বিরক্ত হয়ে আবার ওরা গাড়ি চালিয়ে দিল। ট্রাকগুলোকে পার হয়ে গিয়েও থামল না। ওরা একটা নিরিবিলি জায়গা চায়।

সামনের দিক থেকে হু-হু করে হাওয়া আসছে। মনে হয় কাছাকাছি কোনো বড় নদী আছে। তার আগেই একটা ছোট্ট সরু নদী পড়ল, তার ওপরে একটা ব্রিজ।

সেই ব্রিজের পাশে নদীর ধারে বসে ছিল দুজন লোক। একজন খুব লম্বা, আর একজন বেঁটে। ওদের পোশাক একটু অদ্ভুত। ওরা পরে আছে হাফ প্যান্ট, কিন্তু ঢলঢলে নয়, কোমর থেকে হাঁটু পর্যন্ত চাপা। গায়ে কোনো জামা নেই, দুজনে জড়িয়ে আছে দুটো বেশ বড় চাদর।

এর আগে ব্রিজের ওপর দিয়ে অনেক গাড়ি গেছে, ঐ লোক দুটো একটু নড়াচড়া করেনি। কিন্তু এবার ঐ কালো গাড়িটা আসতেই লোক দুটি চট করে উঠে দাঁড়াল, সোজা চলে এল রাস্তার মাঝখানে।

গাড়িটা যে-রকম জোরে ছুটে আসছে, তাতে ওদের ঠিক ধাক্কা মেরে দেবে। কালো গাড়ির ড্রাইভার ওদের দেখেও গাড়ি থামাবার চেষ্টা করল না। সরাসরি ওদের ওপর দিয়ে গাড়িটা চালিয়ে দিল।

তখন একটা অবিশ্বাস্য কাণ্ড হল। অত জোরে ছুটে-আসা গাড়ির ধাক্কা খেয়েও লোক-দুটো একটুও টলল না। বরং গাড়িটাই প্রায় উল্টে যাচ্ছিল। কোনোক্রমে গাড়িটা সোজা হতেই এবার যেন ভয় পেয়ে গাড়ির ড্রাইভার লোক দুটোকে পাশ কাটিয়ে চেষ্টা করল পালাবার। কিন্তু পারল না। লম্বা লোকটা আর একটা যাচ্ছেতাই কাণ্ড করল। সে গাড়িটা উঁচু করে তুলে ঘোরাতে

লাগল মাথার ওপর। গাড়িটার দরজাগুলো সব খুলে গেল। আর তার থেকে টুপ টুপ করে ইঁদুরের মতন খসে পড়ল সেই কালো পোশাক পরা লোকগুলো, তারা এদিক-ওদিক দৌড়ে পালাতে লাগল। বেঁটে লোকটি তাড়া করে গেল তাদের ধরতে।

লম্বা লোকটি গাড়িটা আবার নামিয়ে আনতেই সুজয়ের মুণ্ডুটা গাড়ি থেকে পড়ে গিয়ে ঠিক একটা বলের মতন গড়াতে লাগল রাস্তার ওপর। লম্বা লোকটা সেটা দেখতে পেয়েই শিস দিয়ে উঠল জোরে। তারপর গাড়িটাকে খেলনার মতন ছুঁড়ে দিয়ে সুজয়ের মুণ্ডুটা তুলে নিল রাস্তা থেকে।

বেঁটে লোকটি কালো-পোশাক-পরা লোকগুলোকে তাড়া করে গিয়েছিল, সেই লোকগুলো ঝপাঝপ নেমে পড়ল জলের মধ্যে। ডুব দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। বেঁটে লোকটিও জলে নামতে যাচ্ছিল, থমকে গেল লম্বা লোকটির শিস শুনে। ফিরে এল তার কাছে।

লম্বা লোকটি তখন সুজয়ের হাত-পাগুলো খুঁজছে। বেঁটে লোকটি এসে সুজয়ের মুণ্ডুটা দেখেই অন্যরকম ভাষায় কী যেন বলল। লম্বা লোকটিও উত্তর দিল সেই ভাষায়।

সুজয়ের দুটো পা আর ডান হাতটা পাওয়া গেছে, কিন্তু বাঁ হাতটা আর পাওয়া যাচ্ছে না কিছুতেই। দুজনেই এদিকে সেদিকে খুঁজতে লাগল। অন্ধকারের মধ্যেও ওদের দেখবার কোন অসুবিধে হয় না। অনেক খোঁজাখুঁজি করে দেখা গেল ভাঙা গাড়িটার মধ্যে স্টিয়ারিংয়ের নীচে সুজয়ের বাঁ হাতটা আটকে আছে। তার একটা আঙুল চিপটে গেছে একেবারে, মাংস কেটে সাদা হাড় বেরিয়ে পড়েছে।

লম্বা লোকটার কোলে রইল সুজয়ের মুণ্ডু, আর বেঁটে লোকটি হাত-পাগুলো গুছিয়ে নিয়ে হাঁটতে লাগল নদীর ধার দিয়ে। বেশ

খানিকটা দূরে এসে নদীর ঢালু পাড়ে নরম মাটির ওপর বসে পড়ল ওরা। তারপর সুজয়ের ধড়টা মাটিতে শুইয়ে দিয়ে মুণ্ডু ও হাত-পাগুলো ঠিক জায়গায় সাজাতে লাগল। বেঁটে লোকটি প্রথমে ডান হাতের জায়গায় বাঁ হাত আর বাঁ হাতের জায়গায় ডান হাত বসিয়েছিল, লম্বা লোকটি সেটা ঠিক করে দিল তাড়াতাড়ি। পা দুটো সামান্য বেঁকে ছিল, তাও ঠিক করে দেওয়া হল। সুজয়ের চোখ দুটো খোলা। মুণ্ডুটা রাস্তায় গড়াবার সময় মুখময় ধুলো লেগে গেছে, বেঁটে লোকটি যত্ন করে মুছে দিল সব ধুলো।

এবার বেঁটে লোকটি মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে চোখ বুজল। ঠিক ধ্যানের মতন ভঙ্গি। হাত দুটো সামনে বাড়ানো। লম্বা লোকটি একটু দূরে দাঁড়িয়ে কোমর থেকে ঘড়ির মতন একটা যন্ত্র বার করে দেখতে লাগল এক দৃষ্টে। ঘড়ির মতনই শব্দ হচ্ছে সেই যন্ত্রটা থেকে।

বেশ কিছুক্ষণ সময় কেটে গেল। কারুর মুখে একটাও কথা নেই, দুজন লোক ঠিক একভাবে রইল। তারপর সেই ঘড়ির মতন যন্ত্রটার আওয়াজ থেমে যেতেই লম্বা লোকটি একটা শিস দিল। বেঁটে লোকটি তক্ষুনি ঝুঁকে ছুঁয়ে দিল সুজয়ের শরীর। তখন একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। সুজয়ের মুণ্ডু, ধড়, কাটা হাত পা—সব কিছু অদৃশ্য হয়ে গেল তক্ষুনি! ঠিক ম্যাজিকের মতন।

বেঁটে লোকটি কিন্তু উঠল না। ঠিক সেইরকম হাত বাড়িয়ে বসে রইল একই জায়গায়। লম্বা লোকটির ঘড়ির মতন যন্ত্রে শুরু হল আবার আওয়াজ। আবার অনেকক্ষণ সময় কাটার পর আওয়াজটা বন্ধ হতেই লম্বা লোকটি শিস দিয়ে উঠল, আর বেঁটে লোকটি তার হাত দুটো তুলে নিল উঁচুতে।

এবার আরও একটা অদ্ভুত ব্যাপার হল। যেখানে সুজয়ের দেহ ছিল, সেখানে চলে এল একটা ফুলগাছ। মাটির মধ্যে

পোঁতা। তাতে একটা মাত্র লাল রঙের ফুল ফুটে আছে। গাছটি বেশি বড় নয়, মাত্র এক হাত উঁচু, তার দুটো ডালে সবুজ পাতা।

বেঁটে লোকটির মুখে এবার ফুটে উঠল একটা খুশির হাসি। সে খুব আদর করে হাত বুলোতে লাগল গাছটার গায়ে। লম্বা লোকটিও মাটিতে বসে পড়ে খুব যত্ন করে দেখতে লাগল গাছটাকে। তারও মুখে বেশ একটা খুশি খুশি ভাব। দুজনে দুজনের দিকে চোখাচোখি করল একবার। তারপর উঠে দাঁড়াল। এবার দুজনে সেই অন্যরকম ভাষায় কিছু কথা বলে সোজা নেমে গেল নদীতে। ডুব দিল, আর উঠল না।

হাওয়ায় দুলতে লাগল সেই ফুলগাছটা। আকাশে একটু-একটু জ্যোৎস্না। ধারেকাছে মানুষজন কেউ নেই। নির্জন নদী-তীর। শুধু নদীর জল পাড়ে এসে লাগার ছলাৎ ছলাৎ শব্দ ছাড়া আর কোনো শব্দ নেই!

বেশ খানিকটা বাদে দুটো ধেড়ে মেঠো ইঁদুর বেরিয়ে এল একটা গর্ত থেকে! সুরুত সুরুত করে এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করতে লাগল। ঘুরতে ঘুরতে তারা চলে এল ফুলগাছটার দিকে। গাছটা থেকে খানিকটা দূরেই তারা থমকে দাঁড়াল। ছুঁচোলো মুখ দুটো উঁচু করে কিসের যেন গন্ধ শুঁকল তারা। তারপর হঠাৎ কিচমিচ করে উল্টো দিকে ছুটে পালাল। যেন তারা বুঝতে পেরেছে, ঐ ফুলগাছটা একটু আগেও ওখানে ছিল না, ওটা সাধারণ গাছ নয়।

একটু বাদে একটা হলদে-কালো হেলে সাপও ব্যাঙ খুঁজতে-খুঁজতে এল ঐখানে। সাপটাও ফুলগাছটার দিকে তাকিয়ে থমকে গেল একটু। সেও বুঝল, ঐ গাছটা অন্যরকম। কিলবিল করে বেঁকে সাপটা চলে গেল দূর দিয়ে।

কেউ জানল না, জ্যোৎস্নার মধ্যে একটা নির্জন নদীর ধারে

সুজয় একটা ফুলগাছ হয়ে হাওয়ায় দুলছে। সুজয় নিজেও জানে না।
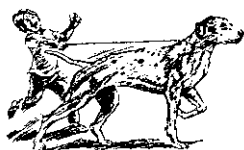
বাবার হারুমামা বললেন, "দেখলে আমার মন্ত্রের জোর! কুকুরটাকে ঠিক ফিরিয়ে আনলাম কিনা?"

মা বললেন, "কিন্তু জয় কোথায়? জয় তো এল না!"

ডুংগা হারুমামাকে দেখে রাগের সঙ্গে গর্‌র গর্‌র শব্দ করল।

হারুমামা হাত তুলে ডুংগাকে বললেন, "আর রাগ করিস না বাবা! সন্ধি, সন্ধি! আমিও আর তোকে মারব না, তুইও আর আমাকে কামড়াতে আসিস না!"

ডুংগা তখন বাবার পায়ের কাছে মুখ নিয়ে ডাকতে লাগল খুব জোরে। বাবা ডুংগার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললেন, "ডুংগা! ডুংগা! কী হয়েছিল? কোথায় গিয়েছিলি?"

ডুংগা এবার এসে মায়ের পায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে মাথা ঘষতে ঘষতে ডাকতে লাগল খুব করুণ সুরে। মা বললেন, "জয় কোথায় গেল? কী সর্বনাশের কথা, ডুংগা ফিরে এল, জয় এল না?"

ডুংগা জয়ের নাম শুনেই ছুটে বেরিয়ে গেল গেট পেরিয়ে রাস্তায়। ডাকতে-ডাকতে খানিকটা দূরে গিয়ে আবার ফিরে এল। সারা পাড়া কাঁপিয়ে সে ডাকছে।

ঝর্না বলল, "বাবা, ডুংগা কিছু বলতে চাইছে। জয়ের বোধহয় কিছু হয়েছে!"

ওরা সবাই মিলে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই ডুংগা আবার ছুটে এগিয়ে গেল খানিকটা। পেছন ফিরে ওদের দেখতে লাগল।

হারুমামা বললেন, "কুকুরটা চাইছে ওর সঙ্গে আমরা যাই।"

সবাই ছুটতে লাগল ডুংগার পেছনে-পেছনে। মা খালি পায়েই বেরিয়ে এসেছেন রাস্তায়। বাড়ির গেট খোলা রয়ে গেল।

ডুংগা বড় রাস্তায় এসে খানিকটা ছুটেই আবার ফিরে-ফিরে এসে খুব জোরে ডাকতে লাগল বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে। সে যেন এখনো খুশি নয়। সে আরও কিছু চায়। ডুংগা সব কিছু বোঝে, শুধু মানুষের মতন কথা বলতে পারে না।

ঝর্না বলল, "বাবা, আমার মনে হচ্ছে, অনেক দূরে যেতে হবে!"

হারুমামা রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, "ট্যাক্সি! ট্যাক্সি!"

দুটো-তিনটে ট্যাক্সি না থেমেই চলে গেল। কিন্তু একটা নীল রঙের ফিয়াট গাড়ি ঘ্যাচাং করে এসে থামল ওঁদের সামনে। পাড়ার অজয় ডাক্তার জানলা দিয়ে মুখ বার করে বললেন, "কী ব্যাপার? এত রাত্রে রাস্তায়?"

বাবা তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে সব ব্যাপারটা খুলে বললেন। অজয় ডাক্তার ব্যস্ত হয়ে বললেন, "সে কী! জয় এখনো ফেরেনি? তাহলে নিশ্চয়ই কোনো গণ্ডগোল হয়েছে।"

হারুমামা বললেন, "কুকুরটা আমাদের কোনো জায়গায় নিয়ে যেতে চাইছে।"

অজয় ডাক্তার বললেন, "উঠে পড়ুন, গাড়িতে উঠে পড়ুন! দেখা যাক ও কোথায় যেতে চায়।"

সবাই হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়তে গেলেন। ডাক্তার মায়ের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বৌদি, আপনি আর যাবেন কী

করতে ? আপনি বরং বাড়িতে গিয়ে থাকুন !"

মা বললেন, "আমি পারব না, আমি একা থাকতে পারব না, আমার বুকের ভেতরটা কেমন যেন করছে !"

"কিন্তু এত রাত্রে আপনি শুধু-শুধু...আমার মনে হয় আপনার বাড়িতে থাকাই উচিত...মনে করুন জয় যদি এর মধ্যে ফিরে আসে, তা হলে কারুকে বাড়িতে পাবে না—ঝর্নাকে নিয়ে আপনি বাড়িতে গিয়ে থাকুন !"

ঝর্না বলল, "না, আমি যাব, আমি বাড়িতে থাকব না।"

বাবা তখন তাঁর হারুমামাকে বললেন, "আপনি তা হলে বরং গিয়ে..."

হারুমামা বললেন, "না, না, আমাকে তো যেতেই হবে।"

মা হঠাৎ বললেন, "আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি একলাই বাড়িতে থাকছি। তোমরা কিন্তু বেশি দেরি করো না।"

এইসব কথাবার্তা যতক্ষণ চলছে, ততক্ষণ ডুংগা প্রাণপণে ডেকে চলেছে। ডুংগা এমনিতে গম্ভীর ধরনের কুকুর, বেশি ডাকে না। আজ সে আকাশ ফাটিয়ে দিচ্ছে।

মাকে বাড়ির কাছে পৌঁছে দিয়ে এসে বাবা উঠে পড়লেন গাড়িতে। তারপর বললেন, "ডুংগাকেও তুলে নিই, নাকি ?"

হারুমামা বললেন, "তা না হলে রাস্তা চেনাবে কে ? ডুংগা রাস্তা দেখালে তবে তো আমরা পেছনে পেছনে যাব !"

তাই হল। গাড়িটা স্টার্ট দিতেই ডুংগা ছুটল সামনের দিকে। এত রাত্রে রাস্তা একদম ফাঁকা, গাড়ি-টাড়ি আর বিশেষ নেই, ডুংগাকে পরিষ্কার দেখা যায়।

হারুমামা একটু বাদে বললেন, "কুকুরটা যদি কোনো গুণ্ডাফুণ্ডার আড্ডায় নিয়ে যায় আমাদের ? আমাদের সঙ্গে তো কোনো অস্ত্র নেই। পুলিশকে একটা খবর দিলে হত না !"

বাবা বললেন, "তার আর সময় নেই। দেখাই যাক না আগে কী হয়!"

ডাক্তার হারুমামার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে জিগ্যেস করলেন, "আপনার তাহলে জলাতঙ্ক রোগ হয়নি শেষ পর্যন্ত! খুব কুকুর ভয় পান, তাই না?"

হারুমামা একগাল হেসে বললেন, "না, না, আসলে আমি একটুও ভয় পাই না। তবে কুকুররা যে গায়ে উঠে পড়ে কিংবা পা চাটে, ওটা পছন্দ করি না। কুকুরের কামড়ানো তো একদমই পছন্দ করি না। ওরা দূরে দূরে থাকলেই ভাল লাগে।"

গাড়ি পেরিয়ে গেল গড়িয়ার মোড়। ঝর্না বলল, "বাবা, জয় এতদূরে নিজে নিজে আসবে কেন বলো তো!"

বাবা বললেন, "কিছুই তো বুঝতে পারছি না।"

হারুমামা বললেন, "ট্রেনিং পাওয়া কুকুররা ঠিক গন্ধ শুঁকে শুঁকে মানুষ খুঁজে বের করে। এ কুকুরটার তো ট্রেনিং নেই কিছু। আমাদের শুধু শুধু ঘোরাচ্ছে না তো?"

ঝর্না বলল, "আমি ঠিক বুঝতে পেরেছি, ডুংগা আমাদের জয়ের কাছেই নিয়ে যেতে চাইছে।"

হারুমামা বললেন, "কী জানি বাবা! কুকুর পাগলা হয়ে গেলে অনেক সময় উল্টোপাল্টা কাজ করে!"

ঝর্না বলল, "ডুংগা মোটেই পাগল না!"

ডুংগা ছুটছে তো ছুটছেই। সে কতদূর যাবে কে জানে!

ডাক্তার বললেন, "একটা মুশকিল, আমার গাড়িতে বেশি তেল নেই। এত রাত্রে তো কোথাও তেল পাওয়া যাবে না!'

হারুমামা বললেন, "এই রে, মাঝরাস্তায় যদি গাড়ি থেমে যায়? রাস্তার মাঝখানে এই ধাদ্ধাড়া গোবিন্দপুরে আমরা তখন কী করব?"

ডাক্তার বললেন, "যা পেট্রল আছে, তাতে আরও দশ পনেরো মাইল চলে যাবে। দেখা যাক কী হয়।"

এবার দেখা গেল, এক জায়গায় রাস্তার মাঝখানে অনেক লোক দাঁড়িয়ে চ্যাঁচামেচি করছে। গাড়িটাকে দেখে তারা রাস্তা আটকে দাঁড়াল। সকলে এক সঙ্গে এমনভাবে কথা বলতে লাগল যে, কিছুই বোঝা গেল না।

হারুমামা ডাক্তারবাবুর গায়ের ওপর ঝুঁকে পড়ে গাড়ির হর্নটা খুব জোরে চেপে ধরলেন, তাতে এত কানে-তালা-লাগানো শব্দ বেরুলো যে, সবাই হঠাৎ চুপ করে গেল। তখন হারুমামা বললেন, "এক-এক করে! এক-এক করে কথা বলতে জানো না?"

এবারও ভিড়ের মধ্যে চার-পাঁচজন লোক এক সঙ্গে চেঁচিয়ে বলল, "আমি বলছি, আমি বলছি!"

হারুমামা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে একজনকে চেপে ধরে বললেন, "শুধু এর কাছ থেকে শুনব। আর সবাই চুপ!"

তখন সেই লোকটি বলল, "গাড়িওয়ালা লোকরা খুব পাজি হয়! তারা গ্রামের লোকদের মানুষ বলেই মনে করে না। খানিকক্ষণ আগে একটা গাড়ি এখানে দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়ির লোকরা শুধু-শুধু একজন লোককে মেরেছে।"

বাবা গাড়ি থেকে নেমে পড়ে হাতজোড় করে বললেন, "দেখুন, আমরা তো কারুকে মারিনি। তা হলে আমাদের আটকাচ্ছেন কেন? আমাদের খুব জরুরি কাজ আছে।"

লোকরা বলল, "দেখুন, আমাদের একজন লোককে কেমন ভাবে মেরেছে। মুখ দিয়ে রক্ত বমি করছে অনবরত!"

রাস্তার পাশে মুখ নিচু করে বসে আছে রতনলাল। কালো গাড়ির লোকগুলো যখন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিল, তখন সে

কিছু টের পায়নি। কিন্তু এখন তার বুকে খুব ব্যথা আর ভলকে-ভলকে রক্ত বেরুচ্ছে মুখ দিয়ে।

গ্রামের লোকরা বলল, "ঐ গাড়ি করে রতনলালকে এক্ষুনি হাসপাতালে পৌঁছে দিতে হবে।"

হারুমামা বললেন, "হাসপাতালে যাবার দরকার কী ! আমাদের সঙ্গেই তো ডাক্তার রয়েছে !"

"কোথায় ডাক্তার ? কে ডাক্তার ?"

অজয় ডাক্তারকে স্টেথোস্কোপ তুলে দেখিয়ে প্রমাণ করতে হল যে তিনি সত্যিই ডাক্তার। তিনি ওষুধের ব্যাগ নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে এলেন।

এদিকে গাড়িটা থেমে গেছে বলে ডুংগা পাগলের মতন চ্যাঁচাচ্ছে। সে এক মিনিট দেরি সহ্য করতে পারছে না। সে ভিড়ের লোকগুলোকে কামড়াতে যাচ্ছে। লোকেরা লাঠি নিয়ে তাড়া করল ডুংগাকে। ঝর্না তখন দৌড়ে গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে ডুংগাকে আড়াল করে দাঁড়াল।

অজয় ডাক্তার রতনলালকে পরীক্ষা করে বিশেষ কিছুই বুঝতে পারলেন না ! তিনি বমি বন্ধ হবার ওষুধ দিলেন। বাবা পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "ওকে আমরা হাসপাতালে নিশ্চয়ই পৌঁছে দিতাম, কিন্তু আমাদের খুব জরুরি কাজ আছে, আমরা একটা ছেলেকে খুঁজতে বেরিয়েছি—"

রতনলাল জিগ্যেস করল, "কত বড় ছেলে ?"

"এই তের-চোদ্দ বছর !"

"ঐ গাড়িতে ছিল, আমি দেখেছি, একটা ছেলে, খুব সম্ভব অজ্ঞান।"

"অজ্ঞান ?"

"হ্যাঁ, কালো রঙের গাড়ি...চারটে কালো পোশাক পরা লোক..."

বাবা ডাক্তারের হাতটা চেপে ধরে বললেন, "শিগগির চলো !"

আবার সবাই হুড়মুড় করে গাড়িতে উঠে পড়লেন। ডুংগা আবার ছুটল। বাবার মুখটা শুকিয়ে গেছে। এতক্ষণ তিনি সুজয়ের কোনো বিপদের কথা ঠিক বিশ্বাস করতে পারছিলেন না। কিন্তু এবার তো মনে হচ্ছে, সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা হয়েছে। চারজন গুণ্ডা...

আরও খানিকটা দূর যাবার পর হঠাৎ গাড়ির গতি কমে এল। ডাক্তার বললেন, যাঃ !

হারুমামা জিগ্যেস করলেন, "কী, পেট্রোল ফুরিয়ে গেল ?"

"এত তাড়াতাড়ি তো ফুরোবার কথা নয় ! তবে অনেক সময় তেল কমে গেলে নীচের ময়লা উঠে আসে—"

"এখন কী হবে ?"

"একটু ঠেললে চলতে পারে।"

হারুমামা বললেন, "অ্যাঁ ? এত রাত্রে গাড়ি ঠেলতে হবে ? হা ভগবান !"

গাড়িটা সত্যিই একদম থেমে গেল। নেমে পড়লেন সবাই। ডাক্তার গাড়ির বনেট খুলে খুটখাট করতে লাগলেন।

হঠাৎ ঝর্না বলল, "ঐ তো একটা গাড়ি ! ওমা, গাড়িটা উল্টে গেছে—"

সবাই তক্ষুনি ছুটলেন সেই গাড়িটার দিকে। ডুংগা ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাড়িটার ওপর। দারুণ রাগে গজরাচ্ছে।

রাস্তার পাশে একদম উল্টে পড়ে আছে গাড়িটা। সামনেই ব্রিজ। গাড়ির ভেতরে উঁকিঝুঁকি মেরে দেখা হল। ভেতরে কেউ নেই। ডুংগা লাফিয়ে ঢুকে গেল গাড়িটার মধ্যে, কামড়ে যেন সীটগুলো সব ছিঁড়ে ফেলবে। তারপর আবার এক লাফে বেরিয়ে এসে নদীর ধার দিয়ে ছুটতে লাগল।

ডুংগা যেখানে গিয়ে থামল, সেখানে কিন্তু ফুলগাছটা নেই! মাটিতে খানিকটা গর্ত করা। ডুংগা সেখানে এসে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াতে লাগল। সে ভীষণ ছটফট করছে। ডুংগার পেছন-পেছন সবাই এসেছিলেন। কেউ কিছুই বুঝতে পারলেন না।

বাবা বললেন, "ডুংগা এ কোথায় আমাদের নিয়ে এল? এখানে কি মাটির তলায় কিছু পোঁতা আছে নাকি?"

ডাক্তার বললেন, "ওই সামান্য একটা গর্ত ছাড়া মাটি তো একদম প্লেন। খোঁড়াখুঁড়ির কিছু চিহ্ন নেই তো!"

ঝর্না বলল, "এখান দিয়ে বোধহয় ওরা জলে নেমে গেছে। জলে নামলে আর কুকুররা গন্ধ পায় না!"

ডাক্তার বললেন, "কাছেই ব্রিজ রয়েছে, শুধু-শুধু জলে নামবে কেন এত রাত্তিরে!"

"যদি জয়কে ওরা জলে ফেলে দেয়?"

"জয় তো সাঁতার জানে!"

"কিন্তু গ্রামের লোকরা যে বলল, জয় তখন অজ্ঞান ছিল?"

হারুমামা বললেন, "ওরা যে জয়কেই দেখেছে, তার কি কোনো ঠিক আছে? অন্য কোনো ছেলেকেও দেখতে পারে। তাছাড়া একটা বাচ্চা ছেলেকে শুধু শুধু লোকেরা জলে ফেলে দেবে কেন? ওর কাছে কি কোনো দামী জিনিস ছিল?"

"না, তা ছিল না অবশ্য।"

"এখন আর খুঁজে লাভ নেই। কাল সকালে পুলিশ নিয়ে আসতে হবে!"

"কিন্তু গাড়িটা এখন চলবে কিনা কে জানে!"

হারুমামা বললেন, "জয়কেও পাওয়া গেল না, আমরাও এখন বাড়ি ফিরতে পারব না! বোঝো ঠ্যালা!"

ভুংগা ওপরের দিকে মুখ করে করুণ সুরে ডাকছে।

বাবা হতাশ হয়ে সেই কাদামাটির মধ্যে ধপ্ করে বসে পড়লেন!

নদীর জল একদম শান্ত হয়ে ছিল। হঠাৎ সেখানে প্রচণ্ড তোলপাড় উঠল। মনে হল যেন বিরাট বিরাট প্রাণীরা জলের নীচে মারামারি করছে। একটু বাদে ভুস্ করে জলের ওপর মাথা তুলল সেই লম্বা লোকটি। খানিকটা সাঁতরে পাড়ের কাছে এসে খুব একটা ভারী কিছু জিনিস টেনে তুলল জল থেকে। তখন দেখা গেল কালো পোশাক পরা চারজন লোকের মধ্যে একজনকে টেনে তুলেছে লম্বা লোকটি।

এর পর সেই বেঁটে লোকটি ভেসে উঠল। সেও চুলের মুঠি ধরে আর-একটা কালো পোশাক পরা লোককে টেনে এনেছে।

জল থেকে উঠেও ওরা একটুও হাঁপাল না। এদিক-ওদিক চেয়ে দেখল। ব্রিজটা থেকে অনেক দূরে চলে এসেছে ওরা।

কালো পোশাক পরা লোক দু'জন অজ্ঞান। তবু লম্বা লোকটি ঐ দুজনের মাথা ঠুকে দিল খুব জোরে। ঠিক যেন লোহার সঙ্গে লোহা ঠোকার মতন শব্দ হল।

লম্বা লোকটা ওদের দু'জনকে ফেলে দিল মাটিতে। তারপর বেঁটে লোকটির সঙ্গে খানিকক্ষণ কথা বলল নিজেদের ভাষায়।

এবার বেঁটে লোকটি কালো পোশাক পরা লোক দু'জনের মাথার কাছে বসল। কোমর থেকে ঘড়ির মতন যন্ত্রটা বার করল

লম্বা লোকটি। বেঁটে লোকটি ধ্যানের ভঙ্গিতে সামনের দিকে হাত দুটো বাড়িয়ে চোখ বুঁজে রইল। খানিক বাদেই অদৃশ্য হয়ে গেল কালো পোশাক পরা লোক দু'জন। সেই জায়গায় ফিরে এল দুটো ঝোপমতন গাছ। গাছগুলোর সব পাতা গোলাপী রঙের। পৃথিবীতে এরকম কোনো গাছ নেই।

লম্বা লোকটি গাছের পাতাগুলোর দিকে আঙুল দেখিয়ে কিছু বলতেই বেঁটে লোকটি আবার গাছ দুটোর পাতা কালচে-সবুজ রঙের করে দিল।

তারপর উঠে দাঁড়িয়ে হাঁটতে লাগল আবার। নদীর ধারে-ধারে কী যেন খুঁজতে লাগল। বেশ খানিকক্ষণ হাঁটার পর ওরা দেখতে পেল সেই ফুলগাছটা। গাছের লাল ফুলটা যেন হঠাৎ হাওয়ায় দুলে উঠল বারবার। বেঁটে লোকটি সেখানে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে প্রথমে গাছটার গায়ে হাত বোলালো আদর করে। তারপর খানিকটা মাটি গর্ত করে শেকড়-সমেত গাছটা তুলে নিল।

এবার তারা ব্রিজ পার হয়ে এসে বড় রাস্তা ধরে হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর রাস্তার ধারেই একটা বড় আমগাছের নীচে থামল। ফুলগাছটা শুইয়ে দিল মাটিতে। তার কাছে হাঁটু গেড়ে বসে বেঁটে লোকটি আবার সেই একই ভাবে চোখ বুজে হাত বাড়িয়ে রইল। লম্বা লোকটার হাতে ঘড়ির মতন যন্ত্র, তাতে শব্দ হচ্ছে টিক টিক টিক টিক। এক সময় শব্দটা থেমে যেতেই লম্বা লোকটি শিস দিয়ে উঠল, বেঁটে লোকটি ঝুঁকে এসে ছুঁয়ে দিল গাছটা।

কিন্তু কিছুই হল না, গাছটা গাছই রয়ে গেল।

লম্বা এবং বেঁটে লোকটি দু'জন খুব চিন্তিত ভাবে তাকাল পরস্পরের দিকে। খানিকক্ষণ নিজেদের মধ্যে কী সব কথা বলল। তারপর দু'জনেই বসল গাছটার পাশে, দু'জনেই এক সঙ্গে

ধ্যানের ভঙ্গিতে চোখ বুজে রইল। যন্ত্রটা রাখা রইল মাটিতে। সেটার শব্দ থেমে যেতেই দু'জনে একসঙ্গে ছুঁয়ে দিল গাছটা।

অমনি গাছটা অদৃশ্য হয়ে গেল।

যন্ত্রটায় শব্দ হতে লাগল আবার। ওরা চোখ খুলল না। বসেই রইল একদম চুপচাপ, একটুও নড়ল না। তারপর এক সময় দেখা গেল, আবছা মতন একটা মানুষের মূর্তি। ঠিক যেন ঘষা কাচ দিয়ে বানানো। ক্রমশ সেটা স্পষ্ট হতে লাগল। এক সময় হঠাৎ সেই মূর্তিটা সুজয় হয়ে গেল।

লোক দুটি এবার চোখ খুলল। হাসি ফুটে উঠল ওদের মুখে। ওরা একদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল সুজয়ের দিকে।

সুজয়ের চোখ বোজা। যেন সে অনেকক্ষণ ধরে ঘুমিয়ে আছে। বেঁটে লোকটি সুজয়ের সারা গায়ে হাত বুলোতে লাগল। সুজয়ের নাক, মুখ, হাত-পায়ের আঙুল দেখতে লাগল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে। সুজয়ের বাঁ হাতের একটা আঙুল থ্যাতলানো। নখের পাশটা অনেকখানি চেপটে গিয়ে রক্ত জমে আছে। বেঁটে লোকটি সেটা দেখাল লম্বা লোকটিকে। লম্বা লোকটি এমন একটা ভঙ্গি করল, যার মানে হল, থাক, ওটুকু থাক।

বেঁটে লোকটি খুব আলতো করে সুজয়ের চোখের পাতায় হাত বোলাতে লাগল। এক সময় সুজয়ের ডান ভুরুটা একটু নড়ে উঠল। তারপর সে স্পষ্ট দুচোখ মেলে তাকাল।

সঙ্গে সঙ্গে লোক দুজন সুজয়ের দু-হাত ধরে দাঁড় করিয়ে দিল রাস্তার উপর।

বেঁটে লোকটি পরিষ্কার বাংলায় বলল, "আপনার লাগেনি তো?"

লম্বা লোকটি ঝুঁকে পড়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে নমস্কার করে জিগ্যেস করল, "কেমন আছেন, জয়বাবু?"

সুজয় একেবারে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। প্রথমটায় সে কিছুই বুঝতে পারল না। সে কোথায় ? মোটরগাড়ির লোকগুলো কোথায় গেল ? ডুংগা কোথায় ? এই লোক দুজন কোথা থেকে এল ?

সুজয় কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়েও পারল না, মুখ খুলে কিছু বলতে গেল, কিন্তু শব্দ বেরোচ্ছে না।

বেঁটে লোকটি সুজয়ের পেট আর বুকে কয়েকটা চাপড় মারতেই সুজয় আঁক করে একটা শব্দ করল। তারপরই জিগ্যেস করল, "আপনারা ?"

লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের চিনতে পারছেন না ?"

সুজয় বলল, "কেন চিনতে পারব না ? আপনাদের কি আমি কখনো ভুলতে পারি ? সেই যে সেবার অজন্তা-ইলোরায় দেখা হয়েছিল !"*

বেঁটে লোকটি বলল, "আবার কেমন দেখা হয়ে গেল !"

সুজয় বলল, "আপনাদের দেখে আমার ভীষণ ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। আমি প্রায়ই আপনাদের স্বপ্নে দেখি। বোধহয় আজও একবার দেখেছি। আমি এখানে কী করে এলাম ? আমাকে চারজন লোক জোর করে নিয়ে যাচ্ছিল !"

বেঁটে লোকটি বলল, "তারপর আপনি গাড়ি থেকে পড়ে গেলেন। সেই জন্যই জিগ্যেস করছিলাম, আপনার লাগেনি তো ?"

সুজয় বলল, "না, শুধু একটা আঙুলে খুব ব্যথা, এই যে, আঙুলটা থেতলে গেছে। আমার জামাটাও একদম ছেঁড়া ! যাক গে। ডুংগা কোথায় ?"

* এই দুজন লোকের আগেরকার কথা আছে এই লেখকের লেখা 'তিন নম্বর চোখ' বইতে।

"ডুংগা কে ?"

"ডুংগা আমার পোষা কুকুর। সে তো গাড়িটার সঙ্গে সঙ্গেই ছুটছিল।"

"সেরকম কোনো কুকুর তো আমরা দেখিনি !"

"আমি কি গাড়িটা থেকে এমনি-এমনি পড়ে গেলাম ? আমার কিছুই মনে পড়ছে না। একটা লোকের চোখ দিয়ে কী বীভৎস সবুজ রঙের আলো বেরুলো...ওঃ, ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক !"

"সত্যিই ওরা সাঙ্ঘাতিক।"

"আপনারাই নিশ্চয়ই ওদের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন। সেবারেও আপনারা আমার বাবাকে আর দিদিকে বাঁচিয়েছিলেন। আপনারা ভীষণ ভাল মানুষ।"

লম্বা লোকটি হেসে বলল, "জয়বাবু, আমরা তো মানুষ নই !"

সুজয় বলল, "জানি ! আপনারা অন্য গ্রহের প্রাণী। কিন্তু মানুষের মতনই তো দেখতে। আমরা বইতে পড়ি, অন্য গ্রহের প্রাণীরা খুব ভয়াবহ। তারা যে-কোনো সময় পৃথিবী ধ্বংস করে দিতে পারে। কিন্তু আপনারা তো সে-রকম নন। আপনারা সত্যিই খুব ভাল।"

লম্বা লোকটি বলল, "আমরা ভালও নই। খারাপও নই। আমরা এই রকমই !"

"কিন্তু আপনারা যে বলেছিলেন আর ফিরে আসবেন না ? আপনারা তো অনেক দূরে থাকেন !"

"কত দূরে মনে আছে ?"

হ্যাঁ, সুজয়ের মনে আছে। ওঁরা সেবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। উরেঃ বাবা, সে এক দারুণ অঙ্ক। যে-কোনো জিনিসের মধ্যেই সবচেয়ে তাড়াতাড়ি ছুটতে পারে আলো। এক বছরে আলো যতখানি দূরে যায় তাকে বলে আলো-বছর। এক বছরে আলো

যায় ১৮৬০০০×৬০×৬০×২৪×৩৬৫ মাইল। এরকম এক কোটি পনেরো লক্ষ আলো-বছর দূরে ওঁদের গ্রহ। পৃথিবীর মানুষ কোনোদিন সেখানে যেতে পারবে না। যেতে যেতেই আয়ু ফুরিয়ে যাবে।

অঙ্কটা মনে পড়ে যাওয়ায় সুজয় দারুণ অবাক হয়ে গিয়ে জিগ্যেস করল, "আপনারা অতদূর থেকে আবার ফিরে এলেন ?"

বেঁটে লোকটি বলল, "না, আমরা যাইনি ! একবার ফিরে গেলে আমরাও আর আসতে পারতাম না।"

"কিন্তু আমি যে সেবার দেখেছিলাম, আপনারা পৃথিবী ছেড়ে চলে যাচ্ছেন ?"

"হ্যাঁ, পৃথিবী ছেড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাছাকাছি একটা গ্রহতে পৌঁছতেই আমাদের কাছে খবর এল আবার পৃথিবীতে ফিরে আসার জন্যই।"

"কেন ?"

"সে অনেক ব্যাপার আছে। আপনাকে পরে বলব।"

সুজয় হঠাৎ এদিক-ওদিক চেয়ে বলল, "এখন ক'টা বাজে বলতে পারেন ?"

লম্বা লোকটি বলল, "তা তো আমরা জানি না। আমরা শুধু দিনরাত্রির হিসেব রাখি।"

সুজয় বলল, "অনেক রাত, আমি বাড়ি ফিরিনি, আমার মা-বাবা দারুণ চিন্তা করছেন। কিন্তু আপনাদের ছেড়ে আমার চলে যেতেই ইচ্ছে করছে না এক্ষুনি ! আমার খুব খিদেও পেয়েছে ! আপনাদের খিদে পায় না ?"

বেঁটে লোকটি হেসে বলল, "পাবে না কেন ? সব প্রাণীরই খিদে পায়। তবে, আমাদের কাছে তো কোনো খাবার নেই। এই গাছটায় ফল ফলে আছে, খাবেন ?"

সুজয় ওপরের দিকে তাকিয়ে বলল, "কাঁচা আম ! নুন পাব কোথায় ? নুন ছাড়া খেলে যে দাঁত টকে যাবে।"

"আমরা পাকিয়ে দিচ্ছি ! পাকা আম খেলে দাঁত টকে যায় না তো ?"

লম্বা লোকটি লাফিয়ে উঠে গাছের একটা ডাল ধরে ফেলল। তারপর ডালটা ধরে নিচু করবার চেষ্টা করতেই ডালটা মড়াৎ করে ভেঙে গেল। আর একটু হলে অতবড় ডালটা সুজয়ের মাথার ওপরে পড়ছিল !

লম্বা লোকটি কয়েকটা আম পটাপট করে ছিঁড়ে দিল বেঁটে লোকটির হাতে। বেঁটে লোকটি সেগুলো মুঠো করে ঝাঁকাতেই সেগুলো হলদে-লাল মেশানো রঙের পাকা আম হয়ে গেল।

সুজয় বলল, "আপনি দারুণ ম্যাজিক জানেন ! সেবারও দেখেছি !"

বেঁটে লোকটি হাসল।

"এগুলো সত্যি-সত্যি পাকা, না চোখের ভুল ? খাওয়া যাবে ?"

"খেয়ে দেখুন !"

সুজয় একটা আমের তলার দিকটা ফুটো করে চুষতে লাগল। সত্যিই পাকা আম। তবে খুব মিষ্টি নয় অবশ্য। ভাল জাতের আম তো নয়।

পর পর দুটো আম খেয়ে সুজয়ের খানিকটা খিদে মিটল। তার মনের মধ্যে একটা খুশি-খুশি ভাব টগবগ করছে। সে যেন একটা নতুন মানুষ হয়ে গেছে হঠাৎ। সে কি এই লোক দুটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে বলে ? ওদের দেখলে সুজয়ের সত্যি খুব ভাল লাগে। ওরা মিষ্টি করে কথা বলে, সুজয়কে আপনি বলে ডাকে।

সুজয় বলল, "মনে হচ্ছে মাঝরাত্তির পেরিয়ে গেছে। এখন আর বাড়ি ফিরবই বা কী করে ! এই রাস্তায় নিশ্চয়ই বাস চলে।

কাল সকালে বাসে করে বাড়ি চলে যাব। আসুন না ততক্ষণ আমরা এই গাছ-তলাটায় বসে একটু গল্প করি।"

লম্বা লোকটি বলল, "বসব ? আমাদের অবশ্য অনেক কাজ—আজ রাত, কালকের দিন আর কালকের রাতের মধ্যে অনেক কাজ শেষ করতে হবে। আচ্ছা, একটু বসা যাক।"

ঐ দুজন লোকের গায়েই লম্বা লম্বা চাদর। বেঁটে লোকটি তার চাদরের একটা পাশ পেতে ফেলল, তার ওপর বসল তিনজনে। সুজয় প্রথমেই বলল, "আমি কিন্তু আপনাদের নাম জানি না। সেবারেও জিগ্যেস করতে ভুলে গেছি। আপনারা আমার নাম জানেন, অথচ...আপনাদের নাম কী ?"

লম্বা লোকটি বলল, "আমাদের নাম ?" তারপর সে বেঁটে লোকটির দিকে তাকাল। তারপর দুজনেই হেসে ফেলল।

বেঁটে লোকটি বলল, "আমাদের নাম শুনে আপনি কিছু বুঝতে পারবেন না। আমাদের গ্রহে আপনাদের মতন এরকম নাম হয় না। আমরা তো শুধু সংখ্যা দিয়ে কথা বলি ! তার চেয়ে এক কাজ করুন। আপনিই আমাদের দুটি নাম বানিয়ে দিন। আপনাদের ভাষায় আমাদের কী নাম হতে পারে বলুন না !"

সুজয়ের প্রথমেই মনে পড়ল লরেল-হার্ডি। তারপর ভাবল, না এটা ঠিক মেলে না। হার্ডি খুব মোটা। এরা তো কেউ মোটা নয়।

তখন সে মুচকি হেসে বলল, "বাংলায় আপনাদের নাম হওয়া উচিত লম্বু আর বাটকুল।"

ওরা দুজনেই বলল, "বাঃ এ তো ভাল নাম। তবে তাই হোক, এখন থেকে আমরা লম্বু আর বাটকুল হলাম !"

সুজয় বলল, "না, না, না ! আমি ঠাট্টা করছিলাম। ও দুটো ভাল নাম নয়। লম্বা আর বেঁটে লোকদের লোকে ঐ নামে

রাগায়। আমি আপনাদের ভাল নাম দিচ্ছি। সুদীর্ঘ আর সুক্ষুদ্র।"

বেঁটে লোকটি জিগ্যেস করলো, "কে সুদীর্ঘ আর কে সুক্ষুদ্র ?"

সুজয় তার দিকেই আঙুল দেখিয়ে বলল, "আপনি সুক্ষুদ্র।"

বেঁটে লোকটি বলল, "না, আমার সুদীর্ঘ নামটা বেশী পছন্দ !"

লম্বা লোকটি বলল, "নিক না, ও-ই সুদীর্ঘ নামটা নিক।"

সুজয় বলল, "না, না, তাতে ঠিক মানাবে না।"

বেঁটে লোকটি বলল, "কেন মানাবে না ? নাম তো একটা যা হোক কিছু হলেই হল।"

সুজয় বলল, "কিন্তু নামের তো একটা করে মানে আছে !"

বেঁটে লোকটা দুঃখ করে তখন বলল, "জয়বাবু, আপনি বুঝি আমাকে খারাপ মানের নামটা দিতে চান ? আপনি আমাকে ভালবাসেন না !"

সুজয় বলল, "আহ্, তা কেন ? আপনার নামের মানেটাও খারাপ নয়। কিন্তু আপনি তো ছোট !"

"কে বলল আমি ছোট ? আমাদের রকেটে যে-রকম জায়গা থাকে, সেই অনুযায়ী আমাদের শরীরের মাপ হয়। দেখবেন, আমি কত বড় হতে পারি ?"

কিন্তু সেটা আর দেখা হল না। তার আগেই রাস্তা দিয়ে একটা গাড়ি এসে গেল। ওরা চমকে সামনে তাকাল। সুজয় ফিসফিস করে বলল, "সেই কালো গাড়িটা !"

একটা কালো গাড়ি ঠিকই, কিন্তু তাতে রয়েছে শুধু একজন ড্রাইভার, রোগা-মতন খাকি জামা-পরা একজন লোক। গাড়িটা থেমে গেল ওদের কাছে। ড্রাইভারটি মুখ বাড়িয়ে জিগ্যেস করল, "দাদা, সোনারপুরের রাস্তা কি এই দিকে ?"

সুজয় উত্তর দিল, "আমরা জানি না।"

"একটু আগে দেখে এলাম সাঙ্ঘাতিক অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। একটা গাড়ি উল্টে গেছে।"

"কোথায় ?"

"এই মাইল দেড়েক দূরে! আপনারা এখানে বসে আছেন কেন ? কোথায় যাবেন ? আমি পৌঁছে দিতে পারি।"

লম্বা লোকটি ফিসফিস করে বলল, "না, আমাদের দরকার নেই। জয়বাবু, একটা কিছু উত্তর দিয়ে দিন !"

সুজয় বলল, "আমাদের কুকুর হারিয়ে গেছে, আমরা কুকুর খুঁজতে বেরিয়েছি।"

লোকটা আবার গাড়ি স্টার্ট করে দিল। গাড়িটা খানিকটা দূরে চলে যাবার পর লম্বা লোকটি বলল, "জয়বাবু, আপনি কালো গাড়ি দেখেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই লোকটা সে দলের নয়।"

"কোন্ দল ?"

"যারা আপনাকে ধরে নিয়ে পালাচ্ছিল। তাদের গায়ে একরকম গন্ধ আছে, দূর থেকেই আমরা তা টের পাই।"

"ঠিক বলেছেন। গাড়িতে উঠে আমিও একটা গন্ধ পাচ্ছিলাম। একটু যেন পচা মাছের মতন গন্ধ। ওরা কারা ? আপনারা ওদের চিনলেন কী করে ?"

"জয়বাবু, আপনাদের পৃথিবীর খুব বড় একটা বিপদ আসছে !"

"কী বিপদ ?"

"আপনি জানেন নিশ্চয়ই আপনাদের পৃথিবীতে মানুষ খুব বেড়ে যাচ্ছে ?"

"হ্যাঁ জানি। সবাই বলে। খবরের কাগজেও খুব লেখে।"

"কেন এত মানুষ বাড়ছে জানেন ? অন্য গ্রহ থেকে প্রচুর প্রাণী এসে মানুষের মত সেজে থাকছে পৃথিবীতে। আপনারা দেখলে

চিনতেই পারবেন না। দিন-দিনই তারা বেশি করে আসছে।"

"কেন, অন্য গ্রহ থেকে তারা পৃথিবীতে আসছে কেন? পৃথিবীটা কি সব গ্রহের চেয়ে ভাল?"

"না, তা নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আপনাদের পৃথিবীটার চেয়ে অনেক অনেক ভাল ভাল গ্রহ আছে। এমন অনেক গ্রহ আছে, যেখানে খাবার-দাবারের কোনো অভাব নেই। সবাই সমানভাবে খেতে পায়। কিন্তু আপনাদের এখানে এমন একটা জিনিস আছে, যা আর বহু জায়গায় নেই।"

"কী সেটা?"

"জল।"

"জল? অন্য জায়গায় জল নেই?"

"অনেক গ্রহতেই নেই! যেসব গ্রহে জল ছিল, সে-সব জায়গাতে জল ফুরিয়ে আসছে খুব তাড়াতাড়ি। অনেকে অন্য গ্রহ থেকে এসে এখান থেকে জল চুরি করে নিয়ে যায়।"

"নিক না, যত ইচ্ছে। আমাদের তো অনেক আছে। জানেন, আমাদের এই পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল আর এক ভাগ স্থল!"

"এই জলও খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে পারে। এমন কী, ইচ্ছে করলে একদিনেও ফুরিয়ে দেওয়া যায়। যাই হোক, এত সব নানারকম গ্রহ থেকে প্রাণী আসছে যে সকলকে আমরাও চিনতে পারি না। এই যে দেখুন, একটু আগে যে-লোকটি একা একা গাড়ি চালিয়ে গেল, ও মানুষ নাও হতে পারে।"

"কেন? ঠিক আমাদের মতই তো কথা বলল।"

"কথা অনেকেই বলতে পারে। কিন্তু এত রাতে একটা লোক গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে, অথচ সোনারপুরের রাস্তা চেনে না, এটা কি স্বাভাবিক?"

"ওরে বাবা! শুনেই ভয় করছে। এরা কি সবাই খুব খারাপ

প্রাণী ?”

“সবাই নয়। তবে অনেকেই খুব হিংস্র। সেই জন্যই দেখবেন, পৃথিবীতে খুন আর মারামারি ক্রমশই খুব বেড়ে যাবে। আপনারা বুঝতে পারবেন না, আপনারা মানুষকেই দোষ দেবেন।”

“আমাকে যারা ধরেছিল, তারাও বাইরের প্রাণী ?”

“ওরা খুব খারাপ ধরনের প্রাণী। ওদের জন্যই আমরা এসেছি। আপনি যে চারজনকে দেখেছিলেন, তাদের মধ্যে দুজনকে আমরা ধরেছি, আর দুজন পালাল।”

সুজয় উত্তেজিতভাবে বলল, “তাদের ধরেছেন ? তারা কোথায় ?”

বেঁটে লোকটি বলল, “তাদের আমরা এখন গাছ বানিয়ে রেখেছি। পরে নিয়ে যাব।”

সুজয় দারুণ সন্দেহের চোখে তাকাল। এরা কি তাকে ছোট ছেলে পেয়ে বোকা বানাবার চেষ্টা করছে নাকি ? মানুষকে কখনো গাছ বানানো যায় ? যত সব গাঁজাখুরি কথা।

সুজয় জিগ্যেস করল, “বলুন না, সেই লোক দুটোকে ধরে কোথায় রেখেছেন !”

“বললুম তো, তাদের গাছ বানিয়ে রেখেছি !”

“যাঃ !”

“বিশ্বাস হল না ?”

“মানুষকে আবার গাছ বানানো যায় নাকি ? আপনারা আমাকে গাছ করে দিতে পারেন ?”

ওরা দুজনে এক সঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। সুজয় সে-হাসির মানে বুঝতে পারল না কিছুই। লম্বা লোকটি বলল, “না, না, জয়বাবু আপনাকে কেন গাছ বানাব ? আপনি তো খারাপ

লোক নন।"

"আমাকে তো হলে সেই গাছ দুটো দেখান।"

"দেখাব।"

"বাকি লোক দুটো কোথায় গেল ?"

"তারা জলে নেমে পড়েছে। ওরা জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে।"

"জলের মধ্যে কতক্ষণ থাকবে ? নিশ্বাস নেবে কী করে ?"

"ওরা পারে। ওরা জলের মধ্যে সাত দিন আট দিনও লুকিয়ে থাকতে পারে। আমাদের সন্দেহ হচ্ছে, আপনাদের এখানে কাছেই যে সমুদ্র, সেখানে অন্য গ্রহ থেকে এরকম অনেক প্রাণী এসে লুকিয়ে আছে। মাঝে-মাঝে তারা মানুষের রূপ ধরে ওপরে এসে ঘুরে বেড়ায় আর কিছু গোলমাল দেখলেই জলে নেমে পড়ে। এদের বাড়তে দিলে পৃথিবীর সর্বনাশ হয়ে যাবে!"

"তাহলে কী হবে ? জলের মধ্যে এদের ধরাও তো যাবে না!"

"সে-ব্যবস্থাও আছে। দু-একটা যন্ত্রপাতি আনতে হবে শুধু। আমরা ভাবছি, এখানকার সমুদ্রটা শুকিয়ে ফেলে খুঁজে দেখব ওরা কতজন লুকিয়ে আছে।"

"সমুদ্র শুকিয়ে ফেলবেন ? তা কখনো সম্ভব ?"

"অসম্ভব কিছুই না। এজন্য আমাদের আর একবার ফিরে যেতে হবে। বেশি দূর নয়। কাছাকাছিই একটা ফাঁকা গ্রহে আমাদের গুদাম ঘর, সেখান থেকে কয়েকটা যন্ত্র নিয়ে আসব, তারপর সমুদ্রের জলটা সরিয়ে ফেলে—"

সুজয় আপন মনে বলল, "অগস্ত্য।"

বেঁটে লোকটি জিগ্যেস করল, "আশ্চর্য! আপনি জানলেন কী করে জয়বাবু ? অগস্ত্য তো আমাদের একটা মেশিনের নাম।"

সুজয় বলল, "না, না, মেশিন নয়। অগস্ত্য একজন ঋষি।

এক সময় দেবতাদের সঙ্গে লড়াই করতে-করতে পালিয়ে এসে অসুররা সমুদ্রের তলায় লুকিয়ে ছিল। তখন অগস্ত্য ঋষি এক চুমুকে সমুদ্রের সব জল খেয়ে ফেললেন, সমুদ্রও শুকিয়ে গেল আর অসুররা বেরিয়ে পড়তে বাধ্য হল !"

লম্বা লোকটি বলল, "বাঃ বেশ চমৎকার গল্প ! মনে হচ্ছে, অগস্ত্য আমাদের গ্রহেরই কেউ। বহুদিন আগে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন।"

বেঁটে লোকটি বলল, "এখন যে প্রাণীগুলো এসেছে, এদেরও অসুর বলা যায়।"

"তাহলে কি আপনারা দেবতা ?"

"তা তো জানি না ! আমাদের কেউ কখনো দেবতা বলেনি। তবে, এই প্রাণীগুলো আমাদের শত্রু !"

"আচ্ছা, আপনারা যখন সমুদ্রটা শুকিয়ে ফেলবেন, তখন আমাকে দেখতে দেবেন ?"

"তা দিতে পারি। কিন্তু আপনি তখন কোথায় থাকবেন ? আমরা কাল রাত্তিরে চলে যাব, আবার ফিরে আসব এগারো দিন এগারো রাত্তির পর।"

"আমাকে একটা খবর দেবেন, তা হলেই আমি চলে আসব। ঠিক আসব।"

"ভাল কথা। চলুন, এবার উঠে পড়া যাক !"

"আর একটা কথা। ঐ লোকগুলো আমাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল কেন ? আমাকে নিয়ে গিয়ে ওরা কী করত ?"

"খুব খারাপ কাজ করত। আপনাকে ওরা মেরে ফেলত।"

"কেন ? শুধু শুধু মানুষকে মেরে ওদের কী লাভ ?"

"ওদের তো হৃৎপিণ্ড নেই !"

"অ্যাঁ ? হৃৎপিণ্ড ছাড়া আবার কেউ বাঁচে নাকি ?

জন্তু-জানোয়ারেরও তো হৃৎপিণ্ড থাকে !"

"ওদের আছে একরকম। তবে আপনারা হৃৎপিণ্ড বলতে যা বোঝেন, সেরকম কিছু নেই ! তাই ওদের দয়া নেই, মায়া নেই, স্নেহ নেই। ওরা ভালবাসতে জানে না। কাঁদতে জানে না। সেই জন্য ওরা ভীষণ নিষ্ঠুর ! ওরা আপনার হৃৎপিণ্ডটা বুক থেকে তুলে নিত। ওরা মানুষের হৃৎপিণ্ড কেটে-কেটে পরীক্ষা করে দেখছে। খুব সম্ভব ওরা মানুষের হৃৎপিণ্ড খেয়েও নেয়। কাঁচা কাঁচা !"

"ওরা রাক্ষস !"

"সেই রকমই অনেকটা। পৃথিবীর মানুষ ওদের সঙ্গে পারবে না, কারণ ওরা নানান রকম রূপ ধরতে পারে। যে-কোনও সময় যে-কোনো রকম সেজে থাকবে। মানুষের পাশে-পাশে একদম সাধারণ মানুষ হয়ে ঘুরবে। কেউ চিনতে পারবে না ! মানুষের মুশকিল এই যে, তারা অন্যরকম চেহারা ধরতে পারে না ! সেই জন্য অন্য গ্রহের অনেক প্রাণীর সঙ্গেই লড়াই করতে গিয়ে মানুষ হেরে যাবে।"

"কিন্তু মানুষ আগে পারত। বইতে পড়েছি আমি ! মহাভারতে আছে, এক ঋষি আর তাঁর বউ হরিণ হয়ে গিয়েছিলেন। রাজা নহুষ এক ঋষির অভিশাপে সাপ হয়ে গেলেন, আবার পরে মানুষ হলেন, অহল্যা বলে এক ঋষির বউ পাথর হয়ে গিয়েছিলেন।"

"হয়তো মানুষ আগে পারত। এখন ভুলে গেছে। কিন্তু এটা খুব সোজা।"

"আমাকে আপনারা শিখিয়ে দেবেন ?"

"দিতে পারি। কিন্তু অনেক সময় লাগবে। আপনার মনটাকে তৈরি করতে হবে অন্য ভাবে।"

"আপনারা যা বলবেন, আমি তাই করব। ওঃ, তাহলে দারুণ

ব্যাপার হবে। আচ্ছা, তখন আমি ইচ্ছে করলে অদৃশ্য হতে পারব ?"

"কেন পারবেন না ? এ আর এমন শক্ত কী ? জল যদি বাষ্প হয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়, তাহলে যে-কোনো জিনিসই হতে পারে।"

"ওঃ, তাহলে দারুণ ব্যাপার হবে। অদৃশ্য হলে আমি যেখানে যখন খুশি যেতে পারব ! ওঃ ! জানেন, আপনাদের ছেড়ে আমার যেতেই ইচ্ছে করছে না। বাড়িতে একটা খবর পাঠিয়ে যদি আমি আপনাদের সঙ্গেই থাকি ?"

"কিন্তু আমাদের যে চলে যেতে হবে, জয়বাবু ! কাল রাত্তিরবেলা আমাদের রকেট ছাড়বে। আজ রাত শেষ হবার আগেই আমাদের পৌঁছোতে হবে সেখানে।"

"আপনাদের রকেট কোথায় আছে ?"

"সমুদ্রের মধ্যে একটা ছোট দ্বীপে।"

"আমাকে সেটা দেখাবেন ?"

"সেখানে আপনি যেতে পারবেন না। তাছাড়া আপনার বাড়িতে তো খবর দেওয়া হয়নি এখনো। চলুন, এগোই। আপনাকে এখানে একা ছেড়ে যেতে আমরা সাহস পাচ্ছি না। আবার কোনো বিপদ হতে পারে ! চলুন সামনে এগোই। রাত শেষ হয়ে এলে আপনাকে আমরা কোনো গাড়িতে তুলে দেবো। সেবারে যে-কথাটা বলেছিলাম, মনে আছে তো ? আমাদের কথা কিন্তু এখন কারুকে বলবেন না ! যখন সময় হবে, তখন পৃথিবীর লোককে আমরা নিজেদের পরিচয় দেবো। এখনো সে সময় হয়নি।"

"পৃথিবীর সবাই আপনাদের ভালবাসবে। কারণ আপনারা আমাদের বন্ধু !"

গাছতলা থেকে উঠে এসে ওরা আবার সামনের দিকে এগোতে

লাগল। এই রাস্তাটা কোথায় কোনদিকে গেছে, সুজয় কিছুই জানে না। কিন্তু এখন আর তার একটুও ভয় করছে না। এরা দুজন সঙ্গে থাকলে আর কোনো ভয় নেই।

খানিকটা রাস্তা এগিয়েই ওরা দেখল, রাস্তার পাশে আর-একটা কালো গাড়ি কাত হয়ে পড়ে আছে। সুজয় চমকে উঠে ভাবল, এটা কি সেই কালো গাড়ি, যেটার মধ্যে তাকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল?

লম্বা লোকটি বলল, "না।"

সুজয় বললে, "কী না ?"

"এটা সেই কালো গাড়ি নয়। সেটা পড়ে আছে ব্রিজের ওপাশে।"

সুজয় আবার চমকে উঠল, সে তো মনে মনে ভেবেছিল, মুখে তো কিছু বলেনি ! এরা মনের কথাও বুঝতে পারে ?

বেঁটে লোকটি হঠাৎ ছুটে গেল উল্টানো গাড়িটার কাছে। তারপর মুখ দিয়ে একটু অদ্ভুত শব্দ করল। সুজয় আর লম্বা লোকটিও সেখানে গিয়ে দেখল, রাস্তার ধারে মাটির ওপর চিত

হয়ে শুয়ে আছে একটা মানুষ।

মুখ দেখেই সুজয় চিনল তাকে। খানিকটা আগে যে-লোকটি একা-একা গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছিল, যে জিগ্যেস করেছিল সোনারপুরের রাস্তা কোন্‌টা, সে।

লোকটি মরে গেছে অনেকক্ষণ। চোখ দুটো খোলা, তাতে দারুণ একটা ভয়ের ভাব।

সুজয় বলল, "অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে! গাড়ি উল্টে গেছে ওর!"

বেঁটে লোকটি বলল, "না। এইখানে দেখুন। লোকটির বুকে...।"

সেদিকে তাকিয়েই শিউরে উঠল সুজয়। তার মাথা ঝিমঝিম করে উঠল। বীভৎস দৃশ্য। লোকটির বুকের বাঁ দিকে একটা বড় চৌকো গর্ত। ঠিক যেন মেশিন দিয়ে কেউ ওর বুকের খানিকটা অংশ কেটে নিয়েছে।

সুজয় বলে উঠল, "সেই লোকগুলো?"

লম্বা লোকটি মাথা নেড়ে জানাল, হ্যাঁ।

বেঁটে লোকটি মরা লোকটার পাশে বসে পড়ে কী যেন দেখছে। এক সময় সে একটা দুঃখের নিশ্বাস ফেলে বলল, "আমি একে বাঁচাতে পারব না!"

সুজয় জিগ্যেস করল, "কেন?"

তক্ষুনি দুপদাপ করে শব্দ হল হঠাৎ, ওরা পেছন ফিরে তাকাবারও সময় পেল না। চার-পাঁচজন কালো পোশাক পরা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ল ওদের ওপর। তাদের হাতে মোটর গাড়ির হ্যাণ্ডেল, জ্যাক, আরও কয়েকটা লোহার জিনিস। লম্বা লোকটার আর বেঁটে লোকটার মাথায় মারতে লাগল সেই লোহা দিয়ে।

ওরা দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে পড়ে গেল চিত হয়ে। পড়েই ওদের দেহগুলো হয়ে গেল যেন মাটির পুতুলের মতন। লোহার

বাড়ি খেয়ে সেগুলো ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তারপর সেই টুকরোগুলো ফটফট শব্দ করে আরও ভাঙতে লাগল নিজে নিজে। একেবারে ধুলোর মতন হয়ে বাতাসের এক ঝাপটায় উড়ে গেল সবসুদ্ধ।

সুজয় নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারল না যেন। তার চোখের সামনেই ঐ লোক দুটো এমনভাবে শেষ হয়ে গেল? তার এত উপকারী বন্ধু, এমন ভাল দুজন লোক মরে গেল এমনি এমনি। চোখ ফেটে জল এল সুজয়ের।

কিন্তু তার কাঁদবারও উপায় নেই। ঐ লোকগুলোর একজন তার চুলের মুঠি ধরে আছে শক্ত করে। সুজয় নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করেও পারল না। ওদের গায়ে অসম্ভব জোর। সুজয় দেখল, ওদের মানুষের মতন দেখতে হলেও গায়ের চামড়া খুব চকচকে। মানুষের চামড়া অত চকচকে হয় না। আর ওদের গায়ে কেমন যেন আঁশটে গন্ধ।

এক ধাক্কায় এবার ওরা সুজয়কে ফেলে দিল মাটিতে। একজন তার পেটের ওপর হাঁটু দিয়ে চেপে রইল। সুজয় কোনোরকমে একবার চেঁচিয়ে উঠল, "মেরে ফেললে, বাঁচাও!"

তারপরই লোকটা তার পেট এত জোরে চেপে ধরল যে, সুজয়ের গলা দিয়ে আর আওয়াজ বেরুলো না। তা ছাড়া, এত রাত্রে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কেই বা তাকে বাঁচাতে আসবে!

একটা লোক বার করল লম্বা একটা তুরপুনের মতন যন্ত্র। মুখটা ছুঁচলো নয়, প্যাঁচানো প্যাঁচানো। যন্ত্রটা উঁচু করতেই ইলেকট্রিক মেশিনের মতন ঘরঘর শব্দ হতে লাগল। যন্ত্রটা নিয়ে লোকটা এগিয়ে এল সুজয়ের বুকের কাছে।

সুজয় চোখ বুজল। সে বুঝে গেল, এই তার শেষ। একবার শুধু মায়ের কথা মনে পড়ল। তারপরই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সুজয় অজ্ঞান হয়ে ছিল মাত্র কয়েক মুহূর্ত। আবার চোখ খুলল একটা বিকট চিৎকার শুনে। কোথা থেকে বিদ্যুতের মতন একটা প্রাণী ছুটে এসে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ঐ লোকগুলোর ওপরে। সেই সঙ্গে সঙ্গে আকাশ ফাটানো গলায় প্রাণীটা ডাকছে, ডাঁউ! ডাঁউ!

সুজয়ের হৃৎপিণ্ডটা লাফিয়ে উঠল বুকের মধ্যে। ডুংগা এসেছে, ডুংগা!

ডুংগা নেকড়ে বাঘের মতন, তার সঙ্গে পারবে এই লোকগুলো?

ডুংগা প্রথমে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ায় লোকগুলো ছিটকে পড়েছিল। সেই তুরপুনের মতন যন্ত্রটাও পড়ে গেছে মাটিতে। এবার লোকগুলো আবার লোহার জিনিসগুলো তুলে নিল ডুংগাকে মারবার জন্য। একজন মাটি থেকে তুরপুনটা তুলতে গেল।

ডুংগা ওদের একজনের কাঁধের মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে, সে লোকটা উবু হয়ে বসে চ্যাঁচাচ্ছে যন্ত্রণায়। সুজয়কে যে হাঁটু দিয়ে চেপে ধরেছিল, সে তখনও ছাড়েনি, ডুংগা এসে কামড়ে ধরল তার হাত। একজন লোহার হ্যাণ্ডেলটা ছুঁড়ে মারল ডুংগার দিকে—কিন্তু ডুংগা চোখের নিমেষে অন্যদিকে সরে গেছে। ওরা কেউ ডুংগার কাছে আসছে না, দূর থেকে মারার চেষ্টা করছে। এর মধ্যে একজন ঝট করে তুলে নিল তুরপুনের মতন যন্ত্রটা!

এবার সে-লোকটি যন্ত্রটা দু'হাতে ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াল, তারপর এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগল ডুংগার দিকে। যন্ত্রটার ঘরর্ ঘরর্ আওয়াজ শুনেই মনে হচ্ছে ওটা সাঙ্ঘাতিক কিছু। ডুংগা লাফিয়ে উঠলে ও যন্ত্রটা বোধহয় ওর মুখের মধ্যে চালিয়ে দেবে।

ডুংগাও খানিকটা ভয় পেয়ে গেছে এবার। সে

ডাকতে-ডাকতে পিছিয়ে যাচ্ছে একটু-একটু। সে বুঝেছে, ঐ যন্ত্রটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে লাভ নেই। লোকটা এবার যন্ত্রটাকে পিচকিরির মতন সামনে ধরে তেড়ে গেল ডুংগার দিকে।

তার আগেই কে যেন লোকটার চুলের মুঠি ধরে শূন্যে তুলে নিল। মাটি থেকে দশ-বারো হাত ওপরে ঝুলে থেকে ছটফট করতে লাগল লোকটা। তাই দেখেই বাকি লোকগুলো ভয়ে ছুট দিল। কিন্তু তাদের মধ্যেই দু-একজনকে ধরে ফেলল অদৃশ্য কেউ। তারপর তাদের মাটির ওপর ফেলে আছাড় মারতে লাগল জোরে-জোরে।

শুধু সুজয় নয়, ডুংগা পর্যন্ত হাঁ করে দেখছে এই দৃশ্য। সুজয় আরও বেশি অবাক হচ্ছে এই জন্য যে, তার ধারণা ছিল গ্রহান্তরের মানুষরা লড়াই করে সাঙ্ঘাতিক সব অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। কিন্তু এরা যে শুধু হাতে লড়াই করে। এই কালো লোকগুলো নিয়ে এসেছে মোটরগাড়ির জিনিসপত্র। ঐ তুরপুনের মতন যন্ত্রটা ছাড়া ওদের নিজস্ব অস্ত্র তো আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

কালো পোশাক পরা লোকগুলোর মধ্যে তিনজন ছটফট করতে লাগল মাটিতে পড়ে। বাকিরা পালাল। তার একটু পরে ওপর থেকে নেমে এল সেই লম্বা ও বেঁটে লোকটি। প্রথমে তাদের চেহারা ছিল কাচের মতন, আস্তে আস্তে স্পষ্ট হল।

যেন কিছুই হয়নি, এইভাবে লম্বা লোকটি ঝুঁকে মিষ্টি গলায় জিগ্যেস করল, "জয়বাবু, আপনার কোনো ক্ষতি হয়নি তো?"

জয় খুব অবাক হয়ে বলল, "আপনারা....মানে, আপনারা বেঁচে আছেন?"

বেঁটে লোকটি বলল, "আমরা তো মরি না! ঐ তো মুশকিল।"

"কিন্তু আমি যে দেখলাম...আপনারা ভেঙে গুঁড়িয়ে..."

লম্বা লোকটি হাসতে লাগল। বেঁটে লোকটি বলল, "ওটা একটা ম্যাজিক দেখালাম!"

ডুংগা সুজয়ের পায়ের কাছে এসে মাথা ঘষছিল, এই লোক দুটিকে দেখে একবার তেড়ে গেল। সুজয় ধমক দিয়ে ডাকল, "ডুংগা!" অমনি সে লক্ষ্মী ছেলের মতন আবার সুড়সুড় করে চলে এল সুজয়ের কাছে।

বেঁটে লোকটি বলল, "কয়েকজন এবারও পালাল। যাক গে। এই তিনটের আগে ব্যবস্থা করে আসি..."

সে হাত ধরে টেনে-টেনে একে-একে তিনজন লোককেই নিয়ে গেল অন্ধকার মাঠের মধ্যে।

লম্বা লোকটি সুজয়কে জিগ্যেস করল, "এটা আপনার কুকুর?"

সুজয় বলল, "হ্যাঁ। উনি ঐ তিনজনকে কোথায় নিয়ে গেলেন?"

"ঐ দিকে রেখে আসবে এক জায়গায়। আপনার কুকুরটা কোথা থেকে এল এখানে?"

"তা তো জানি না! এই ডুংগা, তুই কোথা থেকে এলি রে? এত দূরে পথ চিনে আসতে পারলি?"

ডুংগা দুবার ডেকে উঠল। যেন সে ঠিক উত্তর দিয়ে উঠল কথাটার।

লম্বা লোকটি কথা বলার সময় সেই ঘড়ির মতন যন্ত্রটা বার করে রেখেছিল। এক সময় শিস্ দিয়ে উঠে যন্ত্রটা আবার কোমরে গুঁজল।

সুজয় অবাক হয়ে চেয়ে রইল ওর দিকে। একবার জিগ্যেস করল, "যন্ত্রটা আপনি কোথায় পেলেন? যখন আপনারা অদৃশ্য হয়ে ছিলেন, তখন কি যন্ত্রটাও অদৃশ্য হয়ে ছিল? আপনাদের

শরীর গুঁড়ো হয়ে গেল কেন ? মানুষের শরীর তো গুঁড়ো হয় না।”

লম্বা লোকটি বলল, “এগুলো খুবই সাধারণ বিজ্ঞানের কথা। আমাদের ওখানে সবাই জানে। তবে আপনারা এখনো সে পর্যন্ত পৌঁছননি। এ তো এক্ষুনি বোঝানো যাবে না, পরে যখন আসব, তখন বুঝিয়ে দেবো।”

বেঁটে লোকটি এই সময় ফিরে এল মাঠ থেকে।

সুজয় জিগ্যেস করল, “আপনি ওদের কোথায় রেখে এলেন ?”

“ওদের মাঠের মধ্যে গাছ করে দিয়ে এলাম। আপনাদের পৃথিবীতে আমরা গাছের সংখ্যা বাড়িয়ে যাচ্ছি ! কাল সকালে যখন লোকেরা মাঠে আসবে চাষ করতে, তিনটে নতুন গাছ দেখে অবাক হয়ে যাবে !”

সুজয় বলল, “আমি দেখব। মানুষকে সত্যি গাছ করা যায় ? আমি নিজের চোখে দেখতে চাই !”

এই সময় দূরে শোনা গেল আর-একটা গাড়ির শব্দ। সঙ্গে সঙ্গে ডুংগা ডাকতে লাগল জোরে জোরে। এই ডাক রাগের নয়, আনন্দের।

গাড়িটা একটা জিপ। সেটা খানিকটা কাছে আসতেই তার মধ্য থেকে একজন কেউ চেঁচিয়ে বলল, “জয় ! ডুংগা ! ডুংগা !”

সুজয় বলল, “বাবা ! আমার বাবা এসেছেন !”

লোক দুটি সঙ্গে সঙ্গে চঞ্চল হয়ে উঠল। লম্বা লোকটি বলল, “তাহলে তো আর আপনার বাড়ি ফেরার চিন্তা নেই। এবার আমরা চলি ?”

বেঁটে লোকটি ঠোঁটে আঙুল দিয়ে বলল, “চুপ ! কারুকে বলবেন না !”

সঙ্গে-সঙ্গে ওরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে অন্ধকারে মিলিয়ে

গেল। অমনি খুব মন খারাপ হয়ে গেল সুজয়ের।

জিপ গাড়িটা পৌঁছে গেল এক মিনিটের মধ্যে। সেটা একটা পুলিশের গাড়ি। তা থেকে লাফিয়ে নামলেন একজন পুলিশ অফিসার, সুজয়ের বাবা, অজয় ডাক্তার, ঝর্না আর বাবার হারুমামা! এত লোককে এক সঙ্গে দেখে সুজয় প্রথমে কথাই বলতে পারল না।

ওল্টানো গাড়িটার পাশে মৃত লোকটিকে দেখে পুলিশ অফিসার বললেন, "মাই গড্! এরকমভাবে কে মেরেছে লোকটাকে?"

বাবা এসে সুজয়কে জড়িয়ে ধরে জিগ্যেস করলেন, "জয়, তোর কিছু হয়নি তো? গাড়ি কী করে ওল্টাল? তুই এখানে এলি কী করে? এই লোকটা কে? ওকে কে মেরেছে?"

হারুমামা বাবার কাঁধে চাপড় মেরে বলেন, "আস্তে, আস্তে! ঐটুকু ছেলেকে এক সঙ্গে অত প্রশ্ন করলে ও উত্তর দেবে কী করে! একটু বিশ্রাম নিতে দাও আগে।"
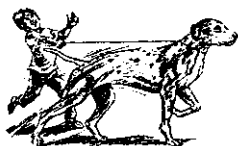
ঝর্না বলল, "জানো মা, ডুংগা যখন সেই নদীটার কাছে থেমে গিয়ে খুব জোরে-জোরে ডাকতে লাগল, আমিও একবার ভেবেছিলাম, সুজয়কে বুঝি কেউ জলেই ফেলে দিয়েছে!"

মা শিউরে উঠে বললেন, "ও কথা বলিস না! উঃ! তোরা ফিরতে দেরি করছিস দেখে আমার এমন চিন্তা হচ্ছিল যে, আর-একটু হলে বোধহয় হার্ট ফেল করত!"

হারুমামা বললেন, "যখন গাড়িটা খারাপ হয়ে গেল, তখন তো

ভাবলাম, মাঠের মধ্যেই সারারাত বসে থাকতে হবে। সুজয়কেও পাওয়া গেল না, কুকুরটাও জলের ধারে থেমে গেল, আমরা মাঠের মধ্যে বোকার মতন দাঁড়িয়ে...কেলেঙ্কারি না কেলেঙ্কারি !"

ঝর্না বলল, "ডুংগাও কী রকম অদ্ভুত ব্যবহার করতে লাগল। নদীর ধারে একটা ছোট গর্তের কাছে গিয়ে গন্ধ শুঁকে বারবার চ্যাঁচাতে লাগল। হ্যাঁ রে, জয়, ঐ গর্তটায় কী ছিল ?"

সুজয় দাঁড়িয়ে আছে জানলার কাছে। সুজয় সুস্থভাবে বাড়ি ফিরেছে বলে সবাই খুব খুশি, কিন্তু সুজয়ের কেমন যেন মন-খারাপ মন-খারাপ ভাব! জানলা দিয়ে তাকিয়ে আছে বাইরে। তার বাঁ হাতের একটা আঙুলে ব্যাণ্ডেজ করা। ছোড়দির কথা শুনে সে বলল, "জানি না তো। নদীর ধারের গর্তের কথা তো কিছু জানি না !"

ঝর্না বলল, "আমরা সে গর্তটা খুঁড়েও দেখলাম খানিকটা। কিছুই নেই। ডুংগা তবু কেন ঐ জায়গাটা আঁচড়াচ্ছিল ?"

হারুমামা বললেন, "কুকুররা ঐ রকম অদ্ভুতই হয়। খানিক বাদে ডুংগা আবার কী রকম সাঙ্ঘাতিক জোরে দৌড়ে চলে গেল। আমাদের দিকে আর তাকালই না !"

বাবা বললেন, "ভাগ্যিস তার একটু পরেই পুলিশের গাড়িটা এসে পড়েছিল !"

সুজয়ের কাকা বললেন, "পুলিশ গুণ্ডাগুলোকে ধরতে পারল না ?"

বাবা বললেন, "চেষ্টা করছে খুব। ধরে ফেলবে ঠিকই। ওখান থেকে আর কোথায় পালাবে ? গাড়ি নিয়ে তো যায়নি !"

সুজয় মনে মনে বলল, "পুলিশ কোনোদিন ওদের খোঁজ পাবে না।"

একটু আগে ভোর হয়েছে। সুজয়দের বাড়ি ভর্তি লোকজন।

শেষ রাতের দিকে মা অসম্ভব ব্যস্ত হয়ে গিয়ে কলকাতার সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে ফোন করেছেন। সুজয়ের মামা, কাকা, মেসোরা ঘুম থেকে উঠে ছুটে এসেছেন তাড়াতাড়ি।

এখন খুব গল্প চলছে। চায়ের জল চাপিয়েছে রঘু। চা খেয়ে সবাই যাবে।

বাবা জিগ্যেস করলেন, "আচ্ছা হারুমামা, একটা কথা সত্যি করে বলুন তো? আপনি যে কুকুর ফেরাবার যজ্ঞটা করলেন, সেটা কি সত্যি? ওরকম কোনো যজ্ঞ হয়?"

হারুমামা হাসতে-হাসতে বললেন, "পাগল নাকি! আমি ওসব যজ্ঞে-ফজ্ঞে বিশ্বাস করি না! ওটা হচ্ছে একটা কায়দা। ঐ রকম যজ্ঞের নাম করে বেশ খানিকটা সময় তো কাটানো যায়—তার মধ্যেই অনেক সময় হারানো জন্তু-জানোয়াররা ফিরে আসে! সেদিন ফিরে এল তো!"

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

বাবা বললেন, "ডুংগা ঠিক সময় না গিয়ে পড়লে গুণ্ডাগুলো জয়কে মেরে ফেলত! আর একটা লোককে কী বীভৎসভাবে মেরেছে!"

ছোটকাকা বললেন, "অদ্ভুত প্রভুভক্ত কুকুর! সে কোথায় গেল? ডুংগা, ডুংগা!"

ডুংগা বসে আছে সুজয়ের পায়ের কাছে। ডাক শুনে সে শুধু মাথা তুলে তাকাল, ওঁদের কাছে গেল না।

ছোটকাকা জিগ্যেস করলেন, "গুণ্ডারা ঐ লোকটাকে মারল কেন রে, জয়? লোকটা কী করেছিল? গাড়িটাও তো নেয়নি!"

সুজয় বলল, "জানি না!"

ঝর্না জিগ্যেস করল, "তুই ঐ নদীটার কাছে গিয়েছিলি?"

"না তো!"

"তুই জানলার ধারে দাঁড়িয়ে আছিস কেন ? এখানে এসে বোস্ না !"

"আসছি !"

সুজয় হঠাৎ শরীরে একটা ঝাঁকুনি খেল। ঘরের সবাই কে কী বলছে তা আর তার কানে গেল না। তার মাথা ঝিমঝিম করছে। সে দেখতে পাচ্ছে অনেক দূরের একটা দৃশ্য। সেই লম্বা ও বেঁটে লোক দুটি মাঠের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের গায়ের চাদর দুটো উড়ছে হাওয়ায়। খুব আস্তে-আস্তে হেঁটে গিয়ে ওরা একটা নদীর পাশে দাঁড়াল। সেখানে শুয়ে আছে সেই কালো পোশাক-পরা একজন লোক। লোকটিকে আহত মনে হয়।

লম্বা ও বেঁটে লোক দুটি বসল গিয়ে ওর পাশে। বেঁটে লোকটি চোখ বুজে হাত দুটো বাড়িয়ে রইল সামনে। লম্বা লোকটি ঘড়ির মতন যন্ত্রটা বার করে রইল। তারপর হঠাৎ অদৃশ্য হয়ে গেল সেই কালো পোশাক পরা লোকটা। আর সেই জায়গায় দেখা গেল একটা ঝোপমতন গাছ !

সুজয় দারুণ উত্তেজিত ভাবে মুখ ফিরিয়ে বলল, "মা— !" বলেই থেমে গেল।

সবাই চমকে তাকাল সুজয়ের দিকে। কিন্তু সুজয় আর কিছুই বলল না। মা জিগ্যেস করলেন, "কী রে ? কী বলছিস ?"

সুজয় বলল, "না, কিছু না।"

তার শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। মা কাছে এসে সুজয়ের মাথা ছুঁয়ে বললেন, "সারা রাত কত ধকল গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। তুই এখন যা, শুয়ে পড় তো গিয়ে !"

সুজয় বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ঐ লোক দুটোর কথা সে আর একটু হলে বলে ফেলছিল। কিন্তু ওরা বারণ করেছে। অবশ্য বললেও নিশ্চয়ই কেউ বিশ্বাস করবে না।

ওদের কথা সুজয় গোপনই রেখে দেবে। আর মন খারাপ করে থাকারও কোনো মানে হয় না। ওরা তো বলেইছে, সুজয়ের সঙ্গে ওদের দেখা হবে আবার।
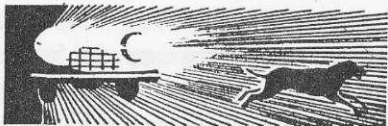
দাঁড়াও পাঠকবর,জন্ম যদি তব এই বঙ্গে

এসেছে নতুন বছর,২০১১ সালের অভ্যন্তরে ঢুকে পড়েছি আমরা। অনেক আশা নিয়ে অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্যের মধ্যে এই লাইব্রেরিটি গড়ে তোলার প্রয়াস,আজ বর্ষশেষের পরিক্রমায় বলতেই হবে যে লক্ষ্য অনেকাংশেই সফল। দেশে বিদেশে আজ শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা নেহাত কম নয়। তাদেও সক্রিয়তাই আমাকে নিত্যনতুন বাধাবিঘ্ন পার হয়েও সাইটটিতে নতুন নতুন বই আপডেট করায় নিয়োজিত রেখেছে।
যারা এ্যাড ব্রাউজ করে আমাকে আর্থিক দিক দিয়ে সাহায্য করছেন,তাদের প্রতি আবারো কৃতজ্ঞতা রইল। আবারও বলছি,যারা বাংলাদেশে থাকেন,তাদের এই কাজে অংশ নেওয়ার দরকার নেই। যারা প্রবাসী,তাদের কাছে অনুরোধ রইল আর একটু বেশী সময় ধরে ব্রাউজ করতে। সম্ভব হলে ভিন্ন আইপি থেকে ব্রাউজ করতে পারেন।
আপনাদের পছন্দের বইটি পেতে চাইলে চ্যাট বক্সে বা আমাকে সরাসরি মেইল করতে পারেন ayan.00.84@gmail.com এ। আমার শহরে বইয়ের প্রাপ্তি সাপেক্ষে আপনাদের চাহিদা মেটাতে চেষ্টা করব। আপনাদের বন্ধুদের মধ্যে যারা এ সাইটের কথা জানেন না,তাদেরকে রেফার করতে পারেন। এছাড়া শীঘ্রই ফেসবুকে একটি পেজ খোলার চিন্তা করছি,যেখানে আপনারা সংযুক্ত থাকতে পারবেন।
মূলত এখনও পর্যন্ত ওয়েবে অপ্রাপ্য বইগুলিই এখানে দেওয়ার চিন্তা আছে,তাই কোন বই আপনি সাজেষ্ট করার আগে বিভিন্ন ফোরাম ঘুরে দেখে নিন সেখানে বইটি আছে কিনা।
বর্তমানে মূলত ভারতীয় লেখকদের লেখাই প্রকাশ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে,পরবর্তীতে বাংলাদেশী লেখকদের লেখাও আনা হবে।
এই প্রচেষ্টার মাধ্যমে লেখক,প্রকাশকদের কোনওভাবে ক্ষতি হোক তা আমরা চাই না,তাই কোন বই আপনার ভাল লাগলে তার হার্ডকপিটা বাজার থেকে কেনার চেষ্টা করুন,প্রিয়জনকে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বই উপহার দিন। আর বেশী বেশী করে বাংলা বই পড়ুন। আপনাদের জীবন বইয়ের আলোকে আলোকিত হয়ে উঠুক,এই কামনায় নতুন বছরের শুভেচ্ছা আরও একবার জানিয়ে শেষ করলাম।

মোবাইলঃ 8801734555541
8801920393900